সপ্তপর্ণী

সাবড়াকোন সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা

২০২২-২০২৩

সাবড়াকোন সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা

সাবড়াকোন ঃঃ বাঁকুড়া

২০২২-২০২৩

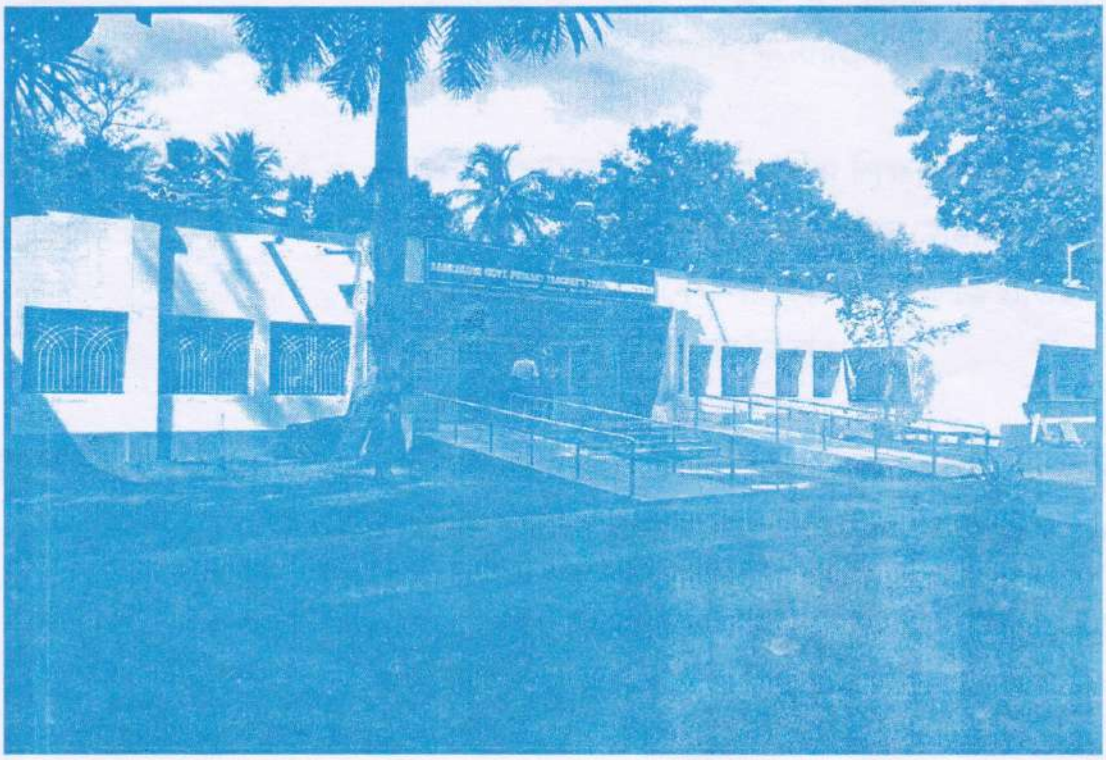

> “পদ্মের মত শিশুদের মন, সূর্যের আলোয় তা অল্প অল্প পাপড়ি মেলে সৌরভ ছড়ায়। যদি আলো বাতাস না থাকে তাহলে শিশুমন ম্লান হয়ে শুকিয়ে যায়। শিশুমনে আলো বাতাস বইয়ে দেওয়াই শিক্ষকের কাজ।”
>
> — রবীন্দ্রনাথ

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের পরিচিতি

পত্রিকা বিভাগ ঃ

সভাপতি ঃ শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ সিংহ (অধ্যাপক)

সম্পাদক ঃ শাহনওয়াজ মণ্ডল

সহ-সম্পাদক ঃ গোবিন্দ কর

পত্রিকা সদস্য ঃ সুরজ মাঝি, অচিন্ত্য পাল, উজ্জ্বলকুমার পতি, শুভাশিষ বেজ, অমিত কুমার গরাই, মনোরঞ্জন মণ্ডল, পদ্মলোচন কর।

সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ সাঁতরা (শিল্প শিক্ষক)

সাংস্কৃতিক বিভাগ ঃ অর্ঘ্য সাহা, আকাশ পতি, মনসা পাঁজা, সমীর মাহাত, সোমনাথ রায়, জয়দেব পরামানিক, কৌশিক প্রতিহার, দেবকান্ত ঘোষ, সৌমেন সাঁতরা।

ক্রীড়া বিভাগ ঃ বিকাশ ব্যানার্জী, বনমালী মণ্ডল, সুমন সরেন, লাল্টুগোপ মণ্ডল, রাজেশ মল্ল, আবির পরামানিক, রামকৃষ্ণ সরেন।

প্রতিষ্ঠানে যারা আছেন

শ্রী মনোজ কুমার পাণ্ডে	(ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)
শ্রী শিবনারায়ণ সিংহ	(অধ্যাপক)
শ্রী শ্যামাপ্রসাদ সাঁতরা	(শিল্প শিক্ষক)
শ্রী পল্লব ঘোষ	(প্রাক্তন অধ্যাপক)
শ্রী সুমন্ত দে	(অতিথি অধ্যাপক)
শ্রী রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর	(অতিথি অধ্যাপক)
শ্রী শুভাশিস দাস	(অতিথি সংগীত শিক্ষক)
শ্রী সুমন অট্ট	(অতিথি অধ্যাপক)
শ্রী পার্থ মণ্ডল	(অতিথি শারীর শিক্ষা শিক্ষক)

অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ

শ্রী দিলীপ বাউরী	(Group D)
শ্রী দীপঙ্কর মাহাত	(DEO)
শেখ সামিম	(MTS)
শ্রী প্রশান্ত দুলে	(Night Guard)

রান্নাঘরের কর্মীবৃন্দ

শ্রী স্বপন কর, শ্রী রঘুনাথ দুলে, শ্রীমতী রমলা দুলে,
শ্রীমতী সুমিত্রা দুলে

চলতি শিক্ষাবর্ষে সম্পাদিত বিশেষ কার্যাবলী

- রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন।
- প্রাক্তনীদের বিদায় সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠান।
- স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন।
- শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন।
- নবীন বরণ অনুষ্ঠান।
- মাননীয়া Director SCERT Madam এর সম্মানার্থে অনুষ্ঠান।
- আগমনী উৎসব।
- শিক্ষামূলক ভ্রমণ পশ্চিম ভারত (অজন্তা গুহা, দৌলতাবাদ ফোর্ট, ইলোরা গুহা)
- নেতাজীর জন্মজয়ন্তী পালন।
- প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন।
- স্বামী বিবেকানন্দ জয়ন্তী উদ্‌যাপন
- সরস্বতী পূজা।
- কাবাডি প্রতিযোগীতা।
- বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন।
- শ্রীনিবাস রামানুজের জন্মজয়ন্তী।
- জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদ্‌যাপন।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের প্রতিবেদন

আপনসত্ত্বার বহিঃ প্রকাশই হলো জীবন সমাজের ধর্ম। সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ নিজের চিন্তনকে প্রকাশ করেছিল গুহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্রে বা দুর্বোধ্য স্বরের ভঙ্গীমায়। সভ্যতার অগ্রগতির রথচক্র আজ ও ক্রমে এগিয়ে চলেছে উন্নতির শিখরে। সেই পথচলা আমাদের ও জীবনের অঙ্গ।

সুস্থ জীবনের লক্ষন প্রকাশ পায় সাংস্কৃতিক মনন ও চিন্তনের মধ্য দিয়ে। সংস্কৃতির প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হল সৃষ্টিশীল মনের বৈশিষ্টগুলির লিপিরূপ, আর এই প্রকাশেরই ''সপ্তপর্ণী'' কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে পরিচর্যার প্রয়োজন শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ তা দৃঢ়ভাবে পালন করতে বদ্ধপরিকর হবে প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ তা দৃঢ়ভাবে পালন করতে বদ্ধ পরিকর হবে প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীবৃন্দের প্রেরণা ও আন্তরিক উৎসাহে এই আস্থা ও কামনা রইল।

ধন্যবাদান্তে —
মনোজকুমার পাণ্ডে
(ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)
সাবড়াকোন সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক
শিক্ষণ সংস্থা

সম্পাদকীয়

আমাদের পত্রিকা 'সপ্তপর্ণী'-র পক্ষ থেকে সকল পাঠকদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনাদের ভালাবাসাকে পাথেয় করে বেশ কিছুটা পথ আমরা একসাথে পেরিয়ে এলাম। এই পত্রিকার সম্পাদনার কাজ পেয়ে নিজেকে গর্বিত মনে হচ্ছে। 'সপ্তপর্ণী'র পুনঃজন্ম হতে চলেছে, তাই আমাদের লেখক শিল্পী এবং সহযোগী বন্ধুদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ। এই যন্ত্র সভ্যতার মানুষ ভাবতে ভুলে যাচ্ছে। আজ সবার মুখে একই কথা ''হাতে যে একদম সময় নেই'। সাহিত্যচর্চা প্রায় অবহেলিত, বাংলা ভাষার পিঠ ঠেকে গেছে দেওয়ালে। তবুও কেউ কেউ তারই মাঝে নামের ভাব কলমের আঁচড়ে অক্ষরের সুষম বিন্যাস সাদা কাগজের বুকে এঁকে যান। এভাবেই সৃষ্টি হয় কখনো কবিতা কখনো গল্প বা আত্মজীবনী, প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গিকের জন্ম, শিল্পীর এই সৃজনশীল সৃষ্টিকে 'সপ্তপর্ণী'র মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখাই আমাদের প্রয়াস। 'সপ্তপর্ণী'র ছায়ায় যেন এই সৃষ্টি অবিরত থাকে পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত।

ধন্যবাদান্তে —
শাহনওয়াজ মণ্ডল
পত্রিকা সম্পাদক
সাবড়াকোন সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক
শিক্ষণ সংস্থা

SABRAKONE GOVT. PRIMARY TEACHER
SABRAKONE BANKURA PIN 722149

নবীন বরণ (বাউল গান)

নবীন বরণ (নাটিকা)

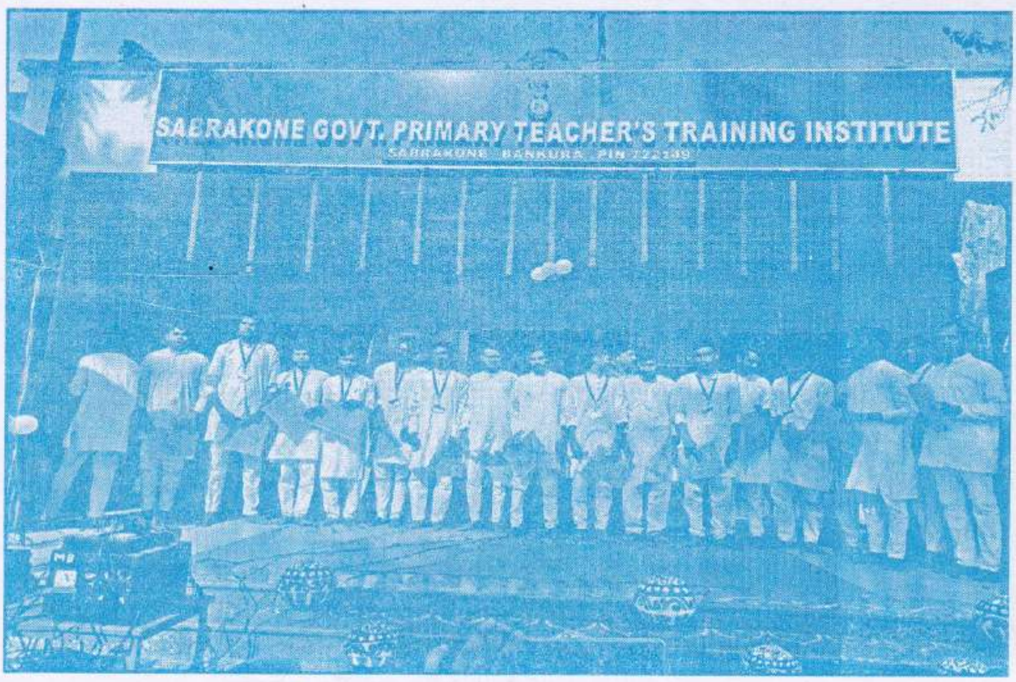
SABRAKONE GOVT. PRIMARY TEACHER'S TRAINING INSTITUTE
SABRAKONE BANKURA PIN 722139

নবীন বরণ (ফাইল ও কলম বিতরণ)

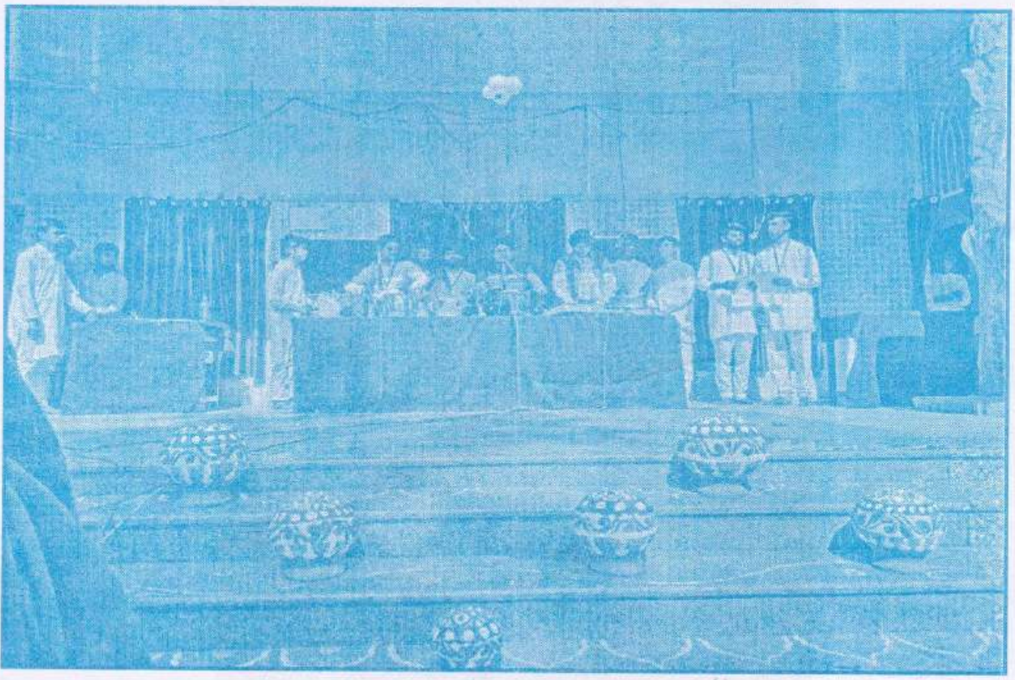

নবীন বরণ (গান)

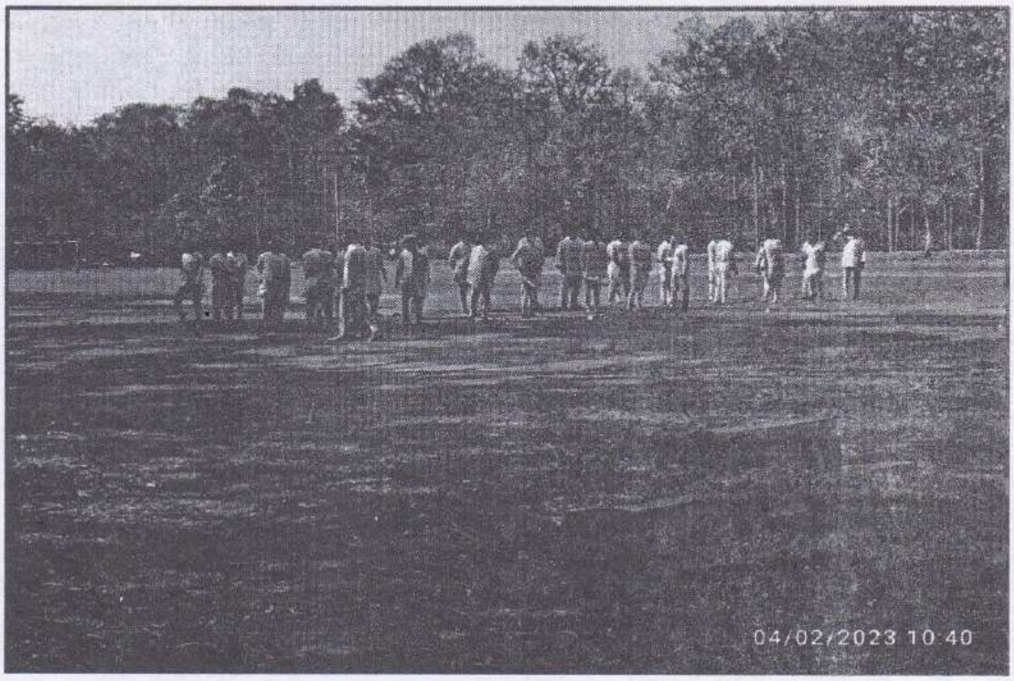

04/02/2023 10:40

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (২০২২-২০২৩)

রবীন্দ্র জয়ন্তী

SABRAKONE GOVT. PRIMARY TEACHER'S TRAINING INSTITUTE
SABRAKONE BANKURA PIN 722149

প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ (বামদিক থেকে ডানদিক) - দীপঙ্কর মহাতো (DEO), শেখ সামিম (MTS), মনোজ কুমার পাণ্ডে (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ), শ্যামাপ্রসাদ সাঁতরা (শিল্প শিক্ষক), সুমন্ত দে (অতিথি অধ্যাপক), রাজেন্দ্র প্রসাদ কর (অতিথি অধ্যাপক), পল্লব ঘোষ (প্রাক্তন অধ্যাপক), শিবনারায়ণ সিংহ (অধ্যাপক), সুভাশিষ দাস (অতিথি সংগীত শিক্ষক), রঘুনাথ দুলে (বাঁধুনি)।

সূচীপত্র

কবিতা

- হারাধনের দশটি ছেলে — অধ্যাপক শিবনারায়ণ সিংহ ১
- শিক্ষা — শাহনওয়াজ মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ) ২
- ভণ্ডামি — অয়ন নন্দী (দ্বিতীয় বর্ষ) ২
- জীবন — সুদীপ মণ্ডল (প্রথম বর্ষ) ২
- গাছ লাগাও — চিন্ময় মণ্ডল (প্রথম বর্ষ) ৩
- নূতন বছর — রাহুল মাল (প্রথম বর্ষ) ৩
- সময় — প্রতীম মুখার্জী (দ্বিতীয় বর্ষ) ৩
- আমি সেই অবহেলা — অনুপ কুমার সৎপতি (প্রথম বর্ষ) ৪
- অনলাইন — নির্মাল্য খাঁ (দ্বিতীয় বর্ষ) ৪
- শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি — সুমন মণ্ডল (প্রথম বর্ষ) ৫
- ম্যাচ যখন রুদ্ধশ্বাস — অনন্ত মাজি (প্রথম বর্ষ) ৫
- আমাদের বাঁকুড়া — সুরজ মাজি (প্রথম বর্ষ) ৬
- ভালোবাসা — শান্তনু কর (প্রথম বর্ষ) ৬
- এই ছেলে — ইন্দ্র হেঁস (দ্বিতীয় বর্ষ) ৭
- ঠকবাজ — সৌভিক পৈলা (দ্বিতীয় বর্ষ) ৭
- পাখি — রঞ্জন দুলে (প্রথম বর্ষ) ৮
- আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান — সুমন বাউরী (প্রথম বর্ষ) ৮
- মোবাইল — প্রীতম ভট্টাচার্য (দ্বিতীয় বর্ষ) ৯
- সময় — রাহুল মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ) ৯
- দীনের সুখ — মনোরঞ্জন মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ) ১০
- মশা — রাজেশ মল্ল (দ্বিতীয় বর্ষ) ১০
- জল নষ্ট মানব কষ্ট — অয়ন মিশ্র (প্রথম বর্ষ) ১১
- নদী — জয়দেব প্রামানিক (প্রথম বর্ষ) ১১
- স্কুল ড্রেস — অমিত পাল (প্রথম বর্ষ) ১২
- মেঘরাজার কাছে আবেদন — মনসা পাঁজা (দ্বিতীয় বর্ষ) ১৩

- তবুও ধর্ষিত — দেবজিৎ মালি (দ্বিতীয় বর্ষ) ১৩
- সাবড়াকোন — পদ্মলোচন কর (দ্বিতীয় বর্ষ) ১৪
- বিংশ শতাব্দী — সোমনাথ রায় (দ্বিতীয় বর্ষ) ১৪
- অচেনা আলো — শোভন ঘোষ (প্রথম বর্ষ) ১৫
- এক অলস দুপুর — শুভজিৎ ঘোষ (প্রথম বর্ষ) ১৫
- মোবাইল — অনুপ কুমার সৎপতি (প্রথম বর্ষ) ১৫
- মনে পড়ে — সুমন সরেন (প্রথম বর্ষ) ১৫
- ছাত্র জীবন বিদায়ী কষ্ট — বরকত মোল্লা (প্রথম বর্ষ) ১৬
- মাঝে মাঝে — তরুন মাহাত (প্রথম বর্ষ) ১৬
- মোবাইল — সাহাবুদ্দিন খান (দ্বিতীয় বর্ষ) ১৭
- বাবা — বনমালী মণ্ডল (প্রথম বর্ষ) ১৭
- মা তুমি এসো ফিরে — অর্ঘ্য সাহা (দ্বিতীয় বর্ষ) ১৮
- নতুন বছর — সোহম মণ্ডল (প্রথম বর্ষ) ১৮
- পরিবেশ দূষণ — অর্জুন গরাই (প্রথম বর্ষ) ১৮
- জীবন মানে বিশ্বময় — অসীম কুমার মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ) ১৯
- প্রিয় খেলা ফুটবল — আবির পরামানিক (দ্বিতীয় বর্ষ) ১৯

গল্প

- পাঁচশো টাকার বাজি — অমিত চৌধুরী (দ্বিতীয় বর্ষ) ২০
- ভেবে অবাক — উজ্জ্বল কুমার পতি (প্রথম বর্ষ) ২২
- গল্পের বই — কৌশিক ঘোষ (প্রথম বর্ষ) ২৩
- দাদুর মুখে শোনা মাসি বাড়ির ভৌতিক কাহিনী — আকাশ পতি (প্রথম বর্ষ) ২৪
- নিঝুম রাতে ভূতের সাথে — সুমন বাউরী (প্রথম বর্ষ) ২৭
- অবশেষে — আয়েতুল্লা খান (প্রথম বর্ষ) ২৯

ভ্রমণ

- একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ — অঙ্কিত দত্ত (প্রথম বর্ষ) ৩১
- চিরস্মরণীয় সেই ভ্রমণ — অচিন্ত্য পাল (প্রথম বর্ষ) ৩৪
- একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা — পিযুষ মণ্ডল (প্রথম বর্ষ) ৩৬

- শিলং ও চেরাপুঞ্জি ভ্রমণ ইন্দ্রজিৎ হাঁসদা (প্রথম বর্ষ) ৩৯
- এক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সৌম্যদীপ মণ্ডল (প্রথম বর্ষ) ৪১
- শিক্ষামূলক ভ্রমণ অধ্যাপক পল্লব ঘোষ ৪৩

প্রবন্ধ

- বর্ষ প্রসঙ্গে (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ) শ্রী মনোজকুমার পাণ্ডে ৪৭
- Implementation of ICT in education Guest Lecturer Rajendra Prasad Kar ৫৪
- মধ্যবিত্তের পাঁচালী মৌমিতা সিনহামহাপাত্র ৫৬
- ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় করোনা মহামারীর প্রভাব বিকাশ ব্যানার্জী (প্রথম বর্ষ).. ৫৭
- কোভিডের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সায়নিক মণ্ডল (প্রথম বর্ষ) ৫৯
- পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার অভিষেক মণ্ডল (প্রথম বর্ষ) ৬২
- বর্তমান সমাজ ও সামাজিক অবক্ষয় কৌশিক প্রতিহার (প্রথম বর্ষ) ৬৩
- প্রকৃত শিক্ষা বনাম বাজারি শিক্ষা অভিক মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ) ৬৫
- গৌতম ও যিশু শুভাশিষ বেজ (দ্বিতীয় বর্ষ) ৬৭
- শিক্ষা ও সমাজ (অতিথি অধ্যাপক) সুমন অট্ট ৭১
- শিক্ষার্থী পরিচিতি ৭৩

প্রচ্ছদ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ সাঁতরা

SABRAKONE GOVT. PRIMARY TEACHER'S TRAINING INSTITUTE
SABRAKONE BANKURA PIN 722149

প্রথম সারি, বামদিক থেকে ডানদিকে (দাঁড়িয়ে) - রাজেশ, সমীর, চিন্ময়, অক্ষয়, শোভন, পদ্মলোচন, অসিত, লাল্টু গোপ, ইন্দ্র, শাহাবুদ্দিন, অঙ্কিত, দেবজিৎ, পীযুষ, কৌশিক, দেবকান্ত, সুরজ, শুভজিৎ, জয়দীপ, আবির, গোবিন্দ, রাহুল, অসীম, অসিত, বরকত, রাকেশ, আয়েতুল্লা, সুমন, অর্জুন।
দ্বিতীয় সারি বাম দিক থেকে ডানদিকে (প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ, চেয়ারে বসে) - সুভাশিষ দাস (অতিথি সংগীত শিক্ষক), শিবনারায়ণ সিংহ (অধ্যাপক), পল্লব ঘোষ (প্রাক্তন অধ্যাপক), মনোজ কুমার পাণ্ডে (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ), দীপঙ্কর মাহাতো (DEO), শেখ সামিম (MTS),
তৃতীয় সারি, বামদিক থেকে ডানদিকে বসে - সৌমদীপ, অয়ন, মনসা, অনুপ, বিপ্লব, প্রীতম, শাহনওয়াজ, বিকাশ, সৌমেন, চিন্ময়, শান্তনু, ইন্দ্রজিৎ, কৌশিক।
চতুর্থ সারি, বামদিক থেকে ডানদিকে বসে - রসিক, অভিক, সৌরভ, সোমনাথ, সৌভিক, সোহম, সুমন, তরুণ, অচিন্ত, রঞ্জন, আকাশ।
পঞ্চম সারি, বামদিক থেকে ডানদিকে বসে - সত্যজিৎ, রাহুল, সুব্রত, দেবাংশু, মনোরঞ্জন, শুভজিৎ, বনমালি, উজ্জ্বল, শুভ।

হারাধনের দশটি ছেলে

অধ্যাপক শিবনারায়ণ সিংহ

১। হারাধনের একটি ছেলে যার নাম দেবীর মধ্যে হয়।
শিক্ষকতা পেশা, কিন্তু ছেনি হাতুড়িতে ব্যস্ত রয়।।
২। হারাধনের অপর ছেলে, যার সাগর তীরে বাস।
পেটের টানে পড়ে আছে, দিন, বছর, মাস।।
৩। হারাধনের একটি ছেলে, যেন গাছের কচিপাতা।
পাকশালার দায়িত্বে থাকে, নিয়ে মোটা খাতা।।
৪। হারাধনের আর এক ছেলে গায় সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি।
মনের খোরাক জুগিয়ে চলে, বাজিয়ে তাহার হারমোণি।।
৫। সুন্দর মনের অধিকারী শিক্ষা-বিজ্ঞানের মধ্যে হাসে।
কখন তিনি ট্রেনে আসেন, কখন আসেন বাসে।।
৬। দেহের সঙ্গে মনের যোগ-ধূলা মাখতে নেই ভয়।
প্রতিযোগিতার ব্যাপার হলে প্রথম পুরস্কারটাই লয়।।
৭। প্রাচ্যে থেকে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিতরণে যার মন।
তাঁর ঝোলায় অনেকে আছে, Shelly, Keats, Byron।।
৮। শিক্ষা বিষয়ের অপর জন, হারাধনের আর এক ছেলে।
বলেন, পরিশ্রমটা স্বার্থক হয়, উপযুক্ত দক্ষিণাটা পেলে।।
৯। প্রযুক্তি বিদ্যায় দক্ষ যিনি, গণকযন্ত্রে গণনা করে।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এলেন তিনি, মা সরস্বতীর বরে।।
১০। আল্লা, যাহার মাথায় আছে, শিক্ষন ট্রেনিংও আছে।
মুচকি হাসির মূর্ছনাতে, মন জয় করেছে সবার কাছে।।
হারাধন যিনি সর্বেসর্বা অনেক গুণই তাঁর রয়।
সব পুত্রের মঙ্গল কামনা রইল, জয় বামুন ঠাকুরের জয়।।

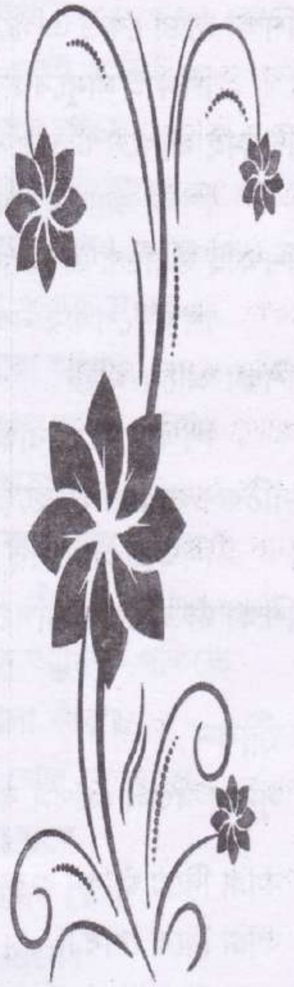

●

শিক্ষা

শাহনওয়াজ মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)

শিক্ষা! শিক্ষা! শিক্ষা!
শিক্ষাই মানুষের সবচেয়ে বড়ো দীক্ষা।
শিক্ষায় মানুষের চেতনা
শিক্ষা ছাড়া কেউ এগিয়ে যেতে পারে না,
শিক্ষাই মানুষের ভবিষ্যৎ
শিক্ষাই জীবনে চলার সঠিক পথ।
শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড
শিক্ষাই উন্নতির একটা বড়ো খণ্ড,
শিক্ষা শেখায় নম্রতা,
শিক্ষা আনে মুক্তি
শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না,
সঠিক চলার পথ ছেড়ে দেবে না,
শিক্ষাই মানুষের চেতনা,
শিক্ষা ছাড়া কেউ এগিয়ে যেতে পারে না।।

●

জীবন

সুদীপ মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)

কান্না দিয়ে জীবন শুরু
কান্না দিয়ে শেষ।
চোখের জলের প্রতিটা কনায়
স্বপ্ন ভরা দ্বেষ।
হাজার রকম ব্যাখ্যা দিয়ে
নানান ওঠাপড়া।
এসব কিছু নিয়েই আমাদের
জীবনের পথ চলা।

●

ভণ্ডামি

অয়ন নন্দী (দ্বিতীয় বর্ষ)

এ শহরে মৃত মানুষেরও চিকিৎসা হয়
পয়সা দিলে মৃতেও কথা বলে।
সে মৃত, আজ সকাল দশটা' তে
ডাক্তার বলেন, এখনো জীবিত সে —
ব্রেইন হেমারেজ, জমা করো ২ লক্ষ
ডাক্তারি মহলে, করবে ডক্টরি মহাযজ্ঞ।
নার্স বেরিয়ে বলল, আনুন সমস্ত ওষুধ —
রোগীর বাড়ি নিতান্তই বেচারা; করলো মহাজনের কাছে সুদ।
কিছু সময় পর বের হলেন ডাক্তার,
নিউরোস্পেশালিস্ট না আনলে রোগী সুস্থ হবে না সত্তর।
বাড়ির কর্তা রোগীকে বাঁচাতে, কিডনি বেচতেও রাজি,
যেমন করেই ডাক্তার বাবু, বাঁচাতে হবে আমাদের কাজী।
রিসেপ্‌সনিষ্ট বলল তখন, আরো করুন ৩ লক্ষ জমা,
আকাশ ভেঙে পড়ল তখন, করা কি যায় না ক্ষমা?
ক্ষমা যদি করি তোমায়, নিয়ে যান্ অন্য কোথাও
চিকিৎসা হবে না, পয়সা ছাড়া হেথায় —
দেবদূত সম কোথা থেকে এলো এক লোক
জব্দ করে, স্তব্ধ করল ওদের ভণ্ডামির শ্লোক।
জীবন যুদ্ধে লিপ্ত মানুষ; সবুজ কিম্বা সাদা নীল,
কলরবে জোট বাঁধুক; এই মিছিলে হও সামিল।।

●

গাছ লাগাও

চিন্ময় মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)

উষ্ণায়নের কবল থেকে সবাই যদি বাঁচতে চাও
বন্ধ করো গাছ কাটা - আরও প্রচুর গাছ লাগাও।
গাছ আমাদের সবার বন্ধু গাছ আমাদের প্রাণ
আম, নারকেল সুস্বাদু ফল সবই তাদের দান।
বাতাস হবে দূষণ মুক্ত আসবে নাকো খরা
সময়মতো আসবে বৃষ্টি সবুজ হলে ধরা।
গড়ছে মানুষ নতুন শহর ধ্বংস করে বন
বন্যপ্রাণী থাকবে কোথায় ভাবছে না কোনো জন।
সবার জন্য এই পৃথিবী গাছ-গাছালি বন্যপ্রাণী
এ সত্যতা না মানলে ভাই রুষ্ট হবে প্রকৃতিরাণী।
মানুষ সবাই জানে বোঝে, তবু বড়ো স্বার্থপর
গড়েই চলেছে কলকারখানা শহর নগর একের পর।

•

সময়

প্রতীম মুখার্জ্জী (দ্বিতীয় বর্ষ)

সময় থেকে শিক্ষা হয়
সময় জানায় আশা
সময় থেকেই সৃষ্টি হয় অভিমানের ভাষা
মানুষ এগিয়ে যায় নিরুপায়ে
যা ছিল আবেগ তা হয় অভিমান
যারা কখনো ছিল হাসির কারণ
তাদের ফলেই এখন গভীর নীরবতা
সময় থেকেই শিক্ষা হয়
সময় জানাই সততা।

•

নূতন বছর

রাহুল মাল (প্রথম বর্ষ)

নূতন বছর নূতন আশা
জাগছে সবার মনে
পুরানো যত ব্যাথা বেদনা
থাকুক সঙ্গোপনে।
সূর্য সে তো একই জানি
তবু নূতন ভাবে আসে
সকল মানুষ বিভেদ ভুলে
আনন্দে আজ ভাসে।
পুরাক বা না পুরাক সবার
মনের হাজারো আশা।
সব আশা হোক শুভয় ঘেরা
থাকুক ভালোবাসা।
বছরের পর বছর আসে যায়
নিয়ম নিগড়ে বাঁধা।
জীবনও চলে আহ্নিক গতিতে
ধাতু আর হাসা কাঁদা।
হাসি কান্নায় গেল যে বাইশ
তেইশ এলো সবে
শুভ বুদ্ধির উদয় হোক
শান্তি নামুক ভবে।
হাজারো আশার একটুকু আশা
পুরাও হে বিশ্ব বিভু
এর বেশি আর কিছু চাইনে
শুধু সবার মঙ্গল করো প্রভু

•

আমি সেই অবহেলা

অনুপ কুমার সৎপতি (প্রথম বর্ষ)

আমি সেই অবহেলা, আমি সেই অসম্মান
আমি সেই মধ্যবিত্ত পরিবারের এক কিশোর সন্তান।
শৈশবকাল থেকে আমি দু-একটা কথা বলি,
মায়ের আঁচল ধরে আমি পথ চলা শুরু করি।
বাবার স্বপ্ন পূরণ এখন আমার লক্ষ্য
সেটা পূরণ করতে হলে এখন আমাকে করতে হবে কষ্ট ভ্রষ্ট।
আমি সেই অবহেলা, আমি সেই অসম্মান
আমি সেই মধ্যবিত্ত পরিবারের এক কিশোর সন্তান।
সমাজের শতবাধা আমাকে আটকে রাখতে চায়।
মা-বাবার আর্শীবাদে সফলতা আমাকে আলিঙ্গন দেয়।
সমাজে যখন আমি প্রতিষ্ঠিত সু-নাগরিক
আমার সুখ্যাতিতে কয়েকটা বন্ধু বান্ধব হয়েছে এদিক ওদিক।
জীবনের সুখে-দুঃখে যারা পাশে ছিলো
আমার সফলতায় তারা আনন্দিত হলো।
অদৃষ্টের খেলায় যখন আমি হেরে গেলাম
সুখ্যাতিতে আসা বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্য না পেলাম
হ্যাঁ আমি সেই অবহেলা, আমি সেই অসম্মান
আমি সেই মধ্যবিত্ত পরিবারের এক কিশোর সন্তান
এমত অবস্থায় যখন আমি পিছনে তাকায়
মা-বাবাকে পিছনে দেখে নয়ন আমার অশ্রু ধারায় ভরে যায়।

●

অনলাইন

নির্মাল্য খাঁ (দ্বিতীয় বর্ষ)

অনলাইনে ডুবে আছে
ইনস্টাগ্রামে ও ফেসবুকে থাকে ম
হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট করে
সকাল সন্ধে সারাক্ষন।
এমন করে চলছে দেশ
চলবে আর কত দিন
ভয়ের নেই কোন লেশ
যুব সমাজের এই হীন।
সময় নেই দুটো কথাবলার।
যুগের সাথে রেখে তাল
ছাত্র-ছাত্রী, পড়ুয়াদের
আজ এই করুন হাল।
প্রকৃতি আজ পায়ের তলে
হেলায় হারাচ্ছে সব
নকলের নেশায় মেতে ওঠা
চলতে এই রব।
বাড়ছে অনলাইন গেম
কমছে মাঠের সখা সখি
তাই আজ চোখে চশমা
ফল ভোগে পশুপাখি।
কবে দেখবে আবার সেদিন
কবে পূর্ণ হবে মনের আশা
চারিদিকে ডাক দেবে সবুজ যেদিন
বাঁধবো নতুন আশা।

●

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি

সুমন মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)

সাবড়াকোন সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষন সংস্থা
কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই আমার গুরু
তাঁদের আর্শীবাদে আমার পথ যে চলা শুরু।
২০২২ এর এক শুভক্ষণে তাঁদের সাথে দেখা
সেদিন থেকে শুরু আমার আসল বিদ্যা শেখা।
অজ্ঞানেরে জ্ঞান দেন তাঁরা, নির্বোধের বোধ
তাঁদের ঋণ শত জন্মেও হবে নাকো শোধ।
সত্য তাঁরা, সুন্দর তাঁরা, তাঁরাই জ্ঞানীগুণী
এসব কথা বাবার কাছে প্রতি দিনই শুনি।
শিক্ষাদান করেন তাঁরা দিয়ে প্রাণ মন
তাঁরাই হলেন বিশ্ব মাঝে শ্রেষ্ঠ আপনজন।
তাঁদের যত উপদেশ লিখি মনের খাতায়
তাঁদের শুভ আশীষ ঝরুক ক্ষুদ্র মনের মাথায়।
আমার সুখে সুখি তাঁরা হন আনন্দিত
তাই মোরা তাঁদের নিয়ে সদাই গর্বিত।
তাঁদের কথা দিনে রাতে সবসময়ই ভাবি
তাঁরাই মোদের এই জীবনের সফলতার চাবি।
তাঁদের কথা সমসময়ই সবখানেতেই স্মরি
তাঁদের ভালো করুন ঠাকুর এই মিনতি করি।

●

ম্যাচ যখন রুদ্ধশ্বাস

অনন্ত মাজি (প্রথম বর্ষ)

ইডেনে ভারত পাকের
রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ
হঠাৎই জুনেইদ
মিস করলো ক্যাচ।
কোহলির হাফসেঞ্চুরি
মারছে যুবরাজ
ভারত যেন প্রতিজ্ঞা করে
হারবো না আজ।
১৩৭ রানের টার্গেট
পাকিস্তানের সামনে
জামসেদ ওপেনার
ভগবানের নাম নে।
রায়নার দারুন বল
৪ ওভারে মাত্র দুই
ভারতের দৃঢ় সংকল্প
জিতব, আজ জিতবই।
ভুবি, জাদেজাদের
দাপট মাঠময়
অবশেষে ভারতই জিতল
ব্যবধান মাত্র ছয়।

●

" I know nothing except the fact of my ignorence" — Socrates

আমাদের বাঁকুড়া

সুরজ মাজি (প্রথম বর্ষ)

আমাদের প্রাণের বাঁকুড়া
বাঁকুড়া যেন আমাদের স্বপ্ন, আবেগ, ভালোবাসা দিয়ে মোড়া
বাঁকুড়া মানে মল্লরাজের ইতিহাস জড়ানো বিষ্ণুপুর।
বাঁকুড়া মানেই এশিয়ার বৃহত্তম মাঁটির বাঁধ মুকুটমণিপুর।
আবার বাঁকুড়া মানেই শুশুনিয়া বিহারীনাথ দিয়ে ঘেরা।
বাঁকুড়া মানেই জগজ্জননী বিশ্বমাতা দেবী সারদার জন্মভূমি।
আবার যিনি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যের দ্বারা রচিল ইতিহাস
বাঁকুড়া জেলায় জন্ম তার ছাতনার চণ্ডিদাস।
চিত্রের জাদুকর বেলিয়াতোড়ের যামিনী রায়
বিশ্বজোড়া খ্যাতি তার ছবি আঁকায় তুলনা তাহার নাই।
বিশ্ববরেণ্য সুরকার যদুভট্ট নাম যার
বাঁকুড়া জেলায় জন্মতার বন্দেমাতরম গানের সুরকার।
নিজের তৈরি ভাস্কর্য দিয়ে করেছেন জগতে মন জয়
রামকিঙ্কর বেইজ যার বাঁকুড়া জেলায় জন্ম হয়।
বাঁকুড়া মানেই টেরাকোটা, হস্তশিল্পের আঁতুড়ঘর।
বাঁকুড়া মানেই পোড়ামাটির ঘোড়া আর ডোকরাশিল্প
শ্যামল সবুজ জঙ্গল ও পাহাড় ঘোরার গল্প
দ্বারকেশ্বর, কংশাবতী, গন্ধেশ্বরী শিলবতী দিয়ে অলঙ্কৃত।
বাঁকুড়া মানেই ঝুমুর, টুসু আর ভাদু গানের সারি।
সবশেষে বাঁকুড়া জেলার তুলনা আর নাই
লালমাটি বাঁকুড়া রাঙামাটি বাঁকুড়াকে প্রণাম জানাই।

●

ভালোবাসা

শান্তনু কর (প্রথম বর্ষ)

ভালোবাসা শুধুমাত্র একটি শব্দ
ভালোবাসা মানে
ছোট্ট একটা মন
ছোটো কিছু আসা
হৃদয়ের মাঝখানে
ছোটো একটি বাসা।
ভালোবাসা মানে
কখনো হাসি কখনোও কান্না
কখনো দুঃখ কখনো বেদনা
ভালোবাসা মানে
আশা নিরাশার খেলা
আর সাত রঙের
রংধনুর খেলা।
ভালোবাসা মানে
আবেগের পাগলামি
ভালোবাসা মানে
কিছুটা দুষ্টামি।
ভালোবাসা মানে
শুধু কল্পনাতে ডুবে থাকা
ভালোবাসা মানে
অন্যের মাঝে নিজের
ছায়া দেখা।

●

*" Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character give him power." — **Abraham Lincoln***

এই ছেলে

ইন্দ্র হেঁস (দ্বিতীয় বর্ষ)

এই ছেলে নাম কি তোমার?
রানা।
থাকো কোথায়?
কেনো, পাশের বসতিতে।
কার সাথে থাকো তুমি?
বাবা তো স্বর্গে গেছে,
থাকি মা আর বোনের সাথে।
আর কি আছে সেথায়?
শুধু কান্না।
স্কুলে যাও?
না, স্কুল যে অনেক দূর।
খেয়েছো?
২ দিন ভাত পায়নি।
সংসার চলে,
ভিক্ষা পেলে
হিন্দু না মুসলিম?
শুধু জনযোদ্ধা
অনেক কষ্ট তোদের
হ্যাঁ, তবে যুদ্ধটা জিতেই নেবো।
দাদা চললাম,
মা আমার অপেক্ষায় আছে।

ঠকবাজ

সৌভিক পৈলা (দ্বিতীয় বর্ষ)

তুমি যাকে বন্ধু ভাবো
সে কী তোমায় বন্ধু ভাবে?
হয়তো সে গোপনে,
তোমার উল্টো পথে হাঁটে।
তুমি যাকে বিশ্বাস করো
জানাও হৃদয়ের গোপনীয়তা।
হয়তো সে চুপিসারে
ছড়িয়ে দেয় সমস্ত কথা।
তুমি যার দুঃখে কাঁদো
কষ্টে দাও সান্ত্বনা।
হয়তো সে পায় আনন্দ
দিলে তোমাকে দুঃখ ও যন্ত্রণা
তুমি যার বিপদে
বাড়িয়ে দাও সাহায্যের হাত।
হয়তো সেই সুযোগে
করে তোমায় নানা উপহাস।
তুমি যার সামনে থেকে,
চাও মঙ্গল কামনা।
হয়তো সে তোমার পিছু
দিতে চায় যন্ত্রণা।

"শিল্পীকে হতেই হবে দায়িত্বশীল মানুষ, তাকে হতে হবে সমাজ ও বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ। চতুর্দিকে যা ঘটছে তার জন্য আমিও কিছুটা দায়ী।" — আন্তন চেকভ।

পাখি

রঞ্জন দুলে (প্রথম বর্ষ)

গাছের ডালে বসে এক পাখি
কী সুন্দর তার আঁখি!
পাখিটি ওড়ে নীল গগনে,
আমি দেখি আপন মনে।
হঠাৎ দেখি একটি বাণ
এল ছুটে হতে কোণখান,
বিঁধল পাখির গায়েতে
পড়ল ঘুরে মাটিতে।
পাখিটিকে নিয়ে এসে
আমার নিজের বাড়িতে
সেবা দিয়ে সুস্থ করি
আমার নিজের হাতেতে।
সুস্থ হলে পাখিটিকে
উড়িয়ে দিই আকাশে,
ডানা মেলে উড়তে থাকে
শান্ত নীরব বাতাসে।

●

আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সুমন বাউরী (প্রথম বর্ষ)

আমাদের গর্ব তুমি, আমাদের প্রাণ,
জ্ঞানের আলো জ্বালাও তুমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
উনিশো উনষাট সালে জন্ম নেবার পর,
কত শত শিক্ষার্থী পেল তোমার বর।
বেলা দশটায় ক্লাস শুরু, চারটায় ছুটি হয়,
প্রিন্সিপ্যাল আর স্যারেরা সব সদায় কাছে রয়।
পড়ান তারা, শাসন করেন, সোহাগ করেন বুকে টেনে,
আমাদের সব দুষ্টুমি, খুশী মনে নেন যে মেনে।
অনেক সময় ভাবি আমি এসব কিসের জন্য।
তাইতো তাঁদের প্রণাম জানাই ধন্য তারা ধন্য।
যখন ছাত্রে ছাত্রে দ্বন্দ্ব, আর যুদ্ধ বিদ্বেষ ...
আমাদের সবার স্থান হল, শিক্ষকের পাদদেশ।
আপনাদের দানে, আপনাদের ধ্যানে; ধন্য হতে চাই,
ভাবতে বড় কষ্ট লাগে, 'কবে ছেড়ে যাই'
সবশেষে রাখি কলম, আবার হবে দেখা,
পরের বছর লিখব কিন্তু, নতুন নতুন লেখা।
জেলা আমার বাঁকুড়া, গোটতোড়িয়াতে বাড়ি
সাবড়াকোন P.T.T.I এর ছাত্র আমি, গর্বে কলম ছাড়ি।

●

মোবাইল

প্রীতম ভট্টাচার্য (দ্বিতীয় বর্ষ)

দেখলাম যখন প্রথম আসে
আমাদের গ্রামে মোবাইল
প্রতিযোগীতা শুরু হল
মোবাইল হাতে স্টাইল।
দেখলো একে একে সবাই দারুন জিনিস
সব সুবিধাই আছে,
হিসেব, সময়, তারিখ, চিঠি
সবেই তো দেখা যাচ্ছে।
ভাবতে ভারি অবাক লাগে
আছে কে কোন দিকে
ভিডিও করে, ছবি করে ও ধরে রাখা যায়
বিশেষ মুহূর্তকে।
প্রথমে নিল চাকুরিজীবি
তারপর নিল বণিক,
একে একে সবাই নিল
তারপর নিল শ্রমিক।
কারো প্রচুর খরচ তাতে কিবা আসে যায়,
সেও রাখবে হাতে হাতে
একবেলা যে খায়।
দেখলাম কাউকে পাগলের মত
আবোল তাবোল বলতে,
দেখলাম কাউকে খোলা ছাদে
একা গভীর রাতে হাঁটতে।
দেখলাম কারও ফোনটি এলে একটু দূরে সরতে
দেখলাম কাউকে স্টেয়ারিং হাতে হাসতে হাসতে মরতে।

●

সময়

রাহুল মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)

ওর অসীম আয়ু
তাই নতুন দিন খোঁজে;
স্বার্থপরের মতো এগিয়ে চলে
কাউকে অপেক্ষা না করেই।।
ওর যৌবন শেষ হবে না;
সবাইকে বুড়ো করে মারবে।
আর নিজের গল্প শুনিয়ে যাবে
রেডিও চ্যানেলের মতো।
প্রাচীন বটগাছটির চেয়েও বৃদ্ধ?
না, সে-ই তো একে বৃদ্ধ করেছে
তবে কি সে অনেক বৃদ্ধ?
নাকি দীর্ঘায়ু চির শিশু?
সে শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সবই
তাই এখনো অনেক দেখবে;
কিন্তু তোমার আয়ু ওর স্বপ্ন অংশ
তাই প্রত্যেকটা ক্ষনকে কাজে লাগাও।।

●

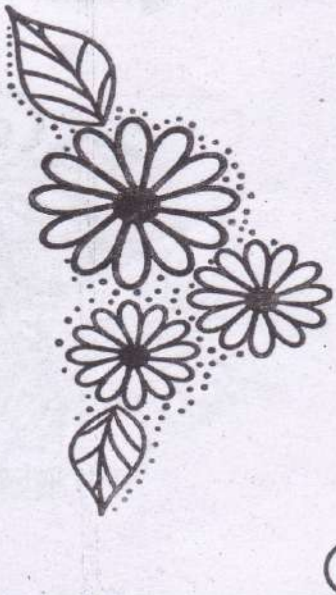

দীনের সুখ

মনোরঞ্জন মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)

বর্ষা আসন্ন,
মাটির দেওয়ালের উপর খড়ের ঘর নেই ছাওয়া
তবে কি বৃষ্টি না পড়লেই ভালো?
তাহলে তো জমিগুলি 'সাহারা' হয়ে যাবে;
দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে শস্যহীনতায়।
একদিকে দুঃখ এবং অন্যদিকে অসীম দুঃখ
তাই সুখের জন্য নির্বাচন করতে হবে দুঃখকেই।

শরৎ কাল খুব সুন্দর;
তাই বলে শ্রাবনে শরৎ কী ভালো?
একজন স্বল্প জমি কৃষকের কাছে
তার তো প্রয়োজন শুধুমাত্র বর্ষা,
সচ্ছলভাবে ধান চাষ করার জন্য।
কঠিন জীবননাষী রোগ হবে জেনেও
ভয় পায় না সে, এই বৃষ্টির জলকে
সুখের জন্য বরণ করে কষ্টকে
এদের কাছে দুঃখ সুখের ফুল নয়
স্বল্প দুঃখই হল অসীম সুখের ফল।

•

মশা

রাজেশ মল্ল (দ্বিতীয় বর্ষ)

পড়ার সময় মশার কামড়
সেকি ভীষণ জ্বালা
শুধু কানের কাছে ভোঁ ভোঁ করে
কানটা ঝালাফালা।
যতই বলি মাফ কর ভাই
পায়ে তোমার পড়ি
পা ছাড়িয়ে মশা বলে
I am Very Sorry
আমার নাম মশা
রক্ত খাওয়া আমার পেশা
জন্ম আমার ড্রেনে
বুদ্ধি থাকে ব্রেনে।
আমার থেকে বাঁচতে হলে
কয়েল জ্বালাও তবে
যাচ্ছ ঘুমে আর দেরি নয়
মশারী টাঙাও সরে।

•

"বাক্য মহান, কিন্তু নীরবতা তার চেয়ে বেশী মূল্যবান" — কার্লাইল

জল নষ্ট মানব কষ্ট

অয়ন মিশ্র (প্রথম বর্ষ)

জল-ই জীবন
জল-ই প্রাণ
জল না থাকলে পৃথিবী
করবে খান খান।
পৃথিবীর ৭০ ভাগ জল, ৩০ ভাগ স্থল,
জল কী তাহলে খুবই বেশী
বেশী হলেই বা হবেটা কী
মানুষ বলছে, সবই তো একদিন শেষ হবে।
কিন্তু সেই একদিন
যদি চলে আসে তাড়াতাড়ি,
শুরু হয়ে যাবে জগতে
বিপদের বাড়াবাড়ি।
জল লাগে তৃষ্ণা মেটাতে,
জল লাগে রান্না করতে,
জল লাগে গাছের জন্য
জল লাগে খাবার তৈরিতে।
জলের এত প্রয়োজন সত্বেও,
মানুষ এত অবিবেচক,
এখন জলের অভাব হওয়ায়
হাহা করছে কৃষক।
সবাই শপথ গ্রহণ করি,
রোধ করব জলের অপচয়
তবেই না পৃথিবী হয়ে উঠবে
সবুজ ও শস্যময়।

•

নদী

জয়দেব প্রামাণিক (প্রথম বর্ষ)

পাহাড় থেকে সৃষ্টি হয়ে
চলে আপন বেগে
পথ যেদিকে পায় সেদিকে যায়
সবার আগে আগে।
কখনও দ্রুত কখনও ধীর
কখনও চঞ্চল কখনও শান্ত
চলে আপন খেয়াল মতো।
চলতে চলতে খুঁজে পায়
বন্ধু কত শত
সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে,
মিলিত হয় মোহনায়
ঝিকমিক করে চাঁদের জোছনায়।
সেই মোহনায় সৃষ্টি হয় ব - এর মতো দ্বীপ
নাম হয় তার ব-দ্বীপ
ফিরে যেতে চাইলে পারে না ফিরতে
সেই বন্ধন ছাড়িয়ে
সব দুঃখ ভুলে সেখানেই থাকে
সকলকে জড়িয়ে।

•

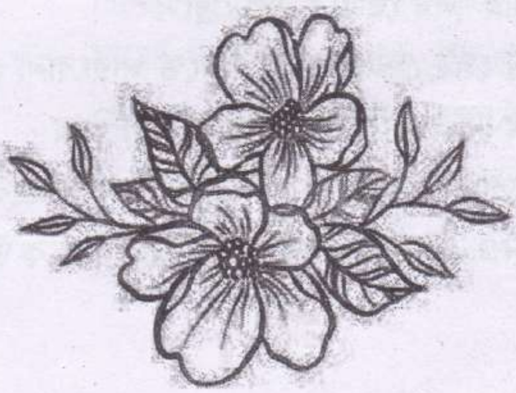

স্কুল ড্রেস

অমিত পাল (প্রথম বর্ষ)

স্কুল ড্রেসটা আজ আলমারিতেই পড়ে আছে।
হয়তো ধুলো ধরে গেছে তাতে।
আর জমে রয়েছে ফেলে আসা
বন্ধুদের সাথে কাটানো দিনগুলো একসাথে।
একটি ড্রেসে আট-দশ বছরের ছাত্রজীবন
সেদিন তো কোনো প্রভাব পড়েনি মনে,
যেদিন সেই ড্রেসটি পরে কাটিয়েছিলাম
তবে আজ মনে পড়ে বারে বারে।
সেই ছুটোছুটি, চেঁচামেচী, হইহুল্লোর, টিফিন অথবা
ছুটির ঘন্টা এখনও বাজে কানে
ছুটির আগেই প্রাচীর ডিঙে পালিয়ে যাওয়া
আজও পড়ে মনে।
স্কুলের সামনে দিয়ে এখনও যদি যায়
চোখের জল কথা বলে, মুখ বোবা রয়ে যায়।
সাইকেল স্ট্যাণ্ডে আড্ডামারা, বেঞ্চেতে নাম লেখা,
টিফিনে পাশাপাশি বসে মিড-ডে-মিল খাওয়া,
প্রতিদিন মারপিট করা, জানালার দিকে তাকিয়ে থাকা
আরো কতকিছু আজ ইতিহাস
স্মৃতিগুলি মিশে আছে স্কুলের শেষে
আমার সেই ছেঁড়া ইস্কুল ড্রেসে
জানি সেই ড্রেসটি আর পরতে পারবোনা কোনোদিন
জানি দিনগুলিও ফিরে আসবে না আর
হয়তো সেই ড্রেস পরার সৌভাগ্য আর হবে নারে
এখনও এই ড্রেস আমার আলমারি থেকে উঁকি মারে।

●

মেঘরাজার কাছে আবেদন

মনসা পাঁজা (দ্বিতীয় বর্ষ)

বর্ষাকালে বঙ্গে এখনও দেখা নেই বর্ষার
মেঘরাজা ঘুমে আচ্ছন্ন
কবে দেবে কালো মেঘ?
ওঠো মেঘরাজা, ওঠো ... জাগো মেঘরাজা, জাগো ...
এই বলে আর্তনাদ করে বাড়ির পাশে থাকা
ভেকগুলো।
তারাও যে স্নান করবে নূতন বর্ষার জলে।
গোয়ালের গাভীগুলোও চেয়ে থাকে মেঘের পানে,
কখন তারা করবে স্নান বর্ষার নূতন জলে।
সকাল থেকে চাষীরাও আশায় থাকে
কখন মেঘরাজা উঠবে জেগে। কারণ
সময় হয়ে এল কখন তারা বুনবে বীজ?
বর্ষার আশায় আমিও দুলাইন লিখে দিলাম
পত্র দ্বারা মেঘরাজাকে আবেদন।
হে মেঘরাজা! এবার গর্জে উঠুন,
থাক না গ্রীষ্ম অদূরে।।

●

তবুও ধর্ষিত

দেবজিৎ মালি (দ্বিতীয় বর্ষ)

ছোট ছিলাম যখন।
মানুষ, চিনতাম না তখন।।
বড়ো হচ্ছি যত।
মানুষ! সে তো পশুদের মত।।
চিৎকার করে বাঁচতে চেয়েছিলে।
দেইনি পশুরা যেতে।
উল্লাসে ওরা মত্ত ছিলো
তারে খুবলে খেতে।।
তবুও ছিল বাঁচার সাধ
তখনও যায়নি মরে।
দশসুরা সব আগুন জ্বালালো
মাগো, বাঁচতে দেয়নি তারে।।
যদি নজরটা না হতো খারাপ
এই সভ্য সমাজের মনুষত্বের।
তবে ঘোমটা-টা না নিলে
বোধহয়, প্রশ্নটা উঠতো না চরিত্রের।।
কাল ছোটো কাপড় দেখে
করেছিলে তো সবাই দোষারোপ।
আজ কেন তাহলে বোরখাওয়ালি তাকেও
দিচ্ছ, নতুন নতুন আরোপ।।
মাগো, আর কত কাল
তোমার মেয়েরা স্বশরীরে জ্বলবে?
নিরাপত্তা চাই বলে
মিথ্যা প্রতিবাদ তুলবে!

●

সাবড়াকোন

পদ্মলোচন কর (দ্বিতীয় বর্ষ)

“সাবড়াকোন”
শত শত স্মৃতি বহনকারী
স্মৃতি সৌধ স্বরূপ।
ক্ষুদ্র হলেও অবদানে মহৎ।
যার অঞ্চলে বিকাশ ঘটেছে।
ছাত্রদের সুপ্ত প্রতিভা।
সে নির্বাক, পাষান, কিন্তু সদা এগিয়ে চলেছে
ভবিষ্যৎ পানে।
স্থির কিন্তু সর্বদা অস্থিরের মত স্বভাব।
পাষাণ, তবুও হৃদয় স্পন্দনের কামাই নেই।
নির্বাক হয়েও কথা বলে।
তবে তাঁর সঙ্গে যে বলতে চায়
যে তার ভাষা বোঝে।
সে উন্মুক্ত প্রানে হাতছানি দিতে জানে
ডাকে বারে বারে পুরানো বন্ধুদের।
এই স্কন্ধে বহন হয়ে চলেছে ছাত্রধারা,
আনন্দভরা হৃদয় যখন একফলকে বরণ করে,
তখন আরেক দলকে ‘বিদায়’ জানিয়ে
হৃদয়কে ক্ষত করে নিয়ে যায়।
সব ব্যাথাতেই সমভাবে ব্যথিত।
সে আমাদের ভালোবাসার বাঁধনে
চিরজীবন বেঁধে রাখতে চায়।
কিন্তু আমাদের বহনকারী দূত ‘সময়’
বিলম্বে বরাবরই নারাজ।

•

বিংশ শতাব্দী

সোমনাথ রায় (দ্বিতীয় বর্ষ)

ওগো বিংশ শতাব্দী তুমি এসেছিলে একদিন
এই পৃথিবীতে অনাড়ম্বরে।
হয়তো সেদিন আলোকের ঝর্ণাধারায়,
সঙ্গীতের ঐকতানে বরণ করেনি কেও তোমাকে।
তোমার যাত্রালগ্নে পৃথিবীটর ছিল ধূসর উষারা
পৃথিবীর তেপান্তরে ছুটে গেছে ক্ষমতালোভি
মানুষের দল। হয়েছে অত্যাচার।
কিন্তু তুমিই করেছ সেই অত্যাচারের অবসান।
তুমি দিয়েছ মানুষকে সান্ত্বনা
তোমার জীবনে ঘটেছে অঘটন।
তুমি দেখেছ ‘ভারতের পরাধীনতার ছবি’
শুনেছ অত্যাচারের কাহিনী।
জানি হিরোসিমা আর নাগাসাকির দুর্ঘটনায়
তোমার শরীর হয়েছিল ক্ষত বিক্ষত।
এসব কাটিয়ে হেসে উঠেছে নানা উপহার।
তোমার জীবন পূর্ণ হয়েছে বিজ্ঞানে।
তাই তোমার মধ্যে নেই এখন আর রুক্ষতা।
জীবন সায়াহ্নে তোমার মুখে হাসি ভরা।
তোমার জীবন এখন বিজ্ঞানে ভরা।
তুমি দিয়েছ অনেক যা ভুলব না কখনও।
নতুন দিনগুলিতে তুমিই হবে পাথেয়।

•

অচেনা আলো

শোভন ঘোষ (প্রথম বর্ষ)

সে আমাকে চিনলো এক অচেনা অবেলায়
আমিও তাকে খুঁজে খুঁজে দূর-দূরান্তর পথে
দাড়িয়ে রইলাম কোন এক সুদূরে —
সে যখন দক্ষিণের জানালা বেয়ে জোছনা উজ্জ্বল,
আলোকিত নয়নে বিভোর ঘুমে শান্তি।
আমিআর অমাবস্যা হয়ে তাকে খুঁজতে চাইনি
নিকটের অন্ধকার অদূরে হারিয়ে গেছে
ভোরের প্রশান্তি ত্যাগ করে নিভে গেছি নীরবে
সে একটিও দীর্ঘশ্বাস ফেলেনি,
দিনের কোলাহলে হারিয়ে গেছে তার সকল বিবেচনা।
আমার ক্ষুদ্র কোন ত্রুটি
তার চোখে পড়েনি।

●

মোবাইল

অনুপ কুমার সৎপতি (প্রথম বর্ষ)

মোবাইল হয়ে কী ঝামেলা
বলবো কি আর ভাই
হরেক রকম অ্যাপ দেখে
পড়ার সময় নাই।
গান, স্ট্যাটাস, গেম
তারপরে যে বই
এসব কিছু দেখে পরে
পড়ার সময় কই
এরপরেও বই এর পড়া
হবে রাখতে মনে।
বছরের শেষ পরীক্ষাটি
হবে ভালো রকমে।

●

এক অলস দুপুর

শুভজিৎ ঘোষ (প্রথম বর্ষ)

আকাশ পানে মেঘের আসর
করছে তারা খেলা
যেমন কোনো নীলসাগরে
ভাসছে কোনো ভেলা
কোথা থেকে মৃদু বাতাস
গাইছে কোনো গান
গানের সুরে ডাকছে আমায়
জুড়িয়ে আমার প্রাণ
গাছের সব ক্লান্ত বড়ই
দুলছে ঢুলে ঢুলে
তারই সাথে তাল মিলিয়ে
ঘাসেরা সব দোলে।

●

মনে পড়ে

সুমন সরেন (প্রথম বর্ষ)

মনে পড়ে সেই ছোট্ট বেলার কথা —
কত বকুনি খেয়েছি,
শুধু আমাকেই বকে।
একদিন পড়তে বসে দাদুকে জিজ্ঞাসা করি
আমাকে শুধু কেন বকে?
দাদু বলেন তুই এখন ছোটো তাই —
আমি দাদুকে বলি আমিও একদিন বড়ো হব
আর কেও আমাকে বকবে না।
তখন বুঝতে পারতাম না কেন আমাকে বকে?
এখন বুঝতে পারি —
এখন বড়ো হয়েছি আর কেউ বকে না।

●

ছাত্র জীবন বিদায়ী কষ্ট

বরকত মোল্লা (প্রথম বর্ষ)

দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করে,
যাবো আমি চলে।
কষ্টে আমার বুক ফেটে যায়।
কাকে জানাইবো আমি বলে।
সুখ-দুঃখ-হাসি আর গানে কেটেছে মোর সময়,
অতীত দিনের স্মৃতি গুলো ভুলার মতো নয়।
ভাবিনি তো ব্যাথা পাবো, বিদায় নেবার কালে,
কত স্মৃতি তুমি দিয়েছো গেঁথে আমার হৃদয়ের জালে।
আমি চলে যাব সব স্মৃতি গুলো ছেড়ে,
ওই স্মৃতি গুলোই বারে বারে আমায় আঁকড়ে ধরে।
ভালোবেসেছিল কত মোরে, বেঁধে ছিল আমার মন জুড়ে,
তবুও চলে যেতে হবে তোমায় ছেড়ে বহু দূরে।
ভাবিতে আমি পারি না যে আর,
সহিতে পারি না যে তোমার ব্যাথা ও বিরহ ভার
বিদায়ী সময় অশ্রুতে আমার ভরে যায় ক্ষত মন,
তাই সকলকে আমি জানাই আমার নমঃ তপ্ত জন।
বিদায়ী কালে জানাই আমার শতকোটি প্রণাম,
আমার এই লেখা, তোমার ওই অবুঝ সন্তান।

●

মাঝে মাঝে

তরুণ মাহাত (প্রথম বর্ষ)

নির্জন রাত্রির শীতল স্পর্শ
কুয়াশা করছে ঢাকা,
Playlist এ বাজছে Arijit Singh
আমি বড্ড একা।
ক্ষনে ক্ষনে শুধু পড়ছে মনে
ভাসছে চোখ দুটি।
কাছে পেলে আগলে রাখতাম
যেন ডুবুসাগরে খড় কুটি।
ঘুমহীন মোর চোখ দুটি
শুধু পথ চেয়েই থাকে।
অপেক্ষায় যে বেলা বয়ে যায়
তার হিসেব কেই বা রাখে।?
পাশে আছো সর্বদা আমার
তাও কাছে একটু চাই,
তাইতো বলি হেঁয়ালির ছলে
মাঝে মাঝে তব দেখা পাই।।

●

মোবাইল

সাহাবুদ্দিন খান (দ্বিতীয় বর্ষ)

মোবাইল, মোবাইল, মোবাইল
মোবাইল আছে অনেক প্রকার —
কখনো সে Smart
আবার কখনো Keypad
কিন্তু তাতে কী?
বর্তমান জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সাথী।
পড়াশোনা থেকে অনলাইন Shopping
মানুষ কে করেছো গৃহবন্দী
দেখিয়েছো তোমার কেরামতি।
খেলা থেকে সিরিয়াল
গান থেকে মুভি
এই যন্ত্রে আছে আরো কত কী,
ট্রেনে বাসে নিঃসঙ্গ লাগে যখন,
হাতের মুঠোর পাই তখন।

◆

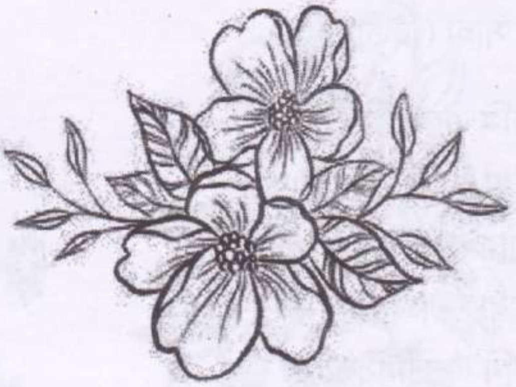

বাবা

বনমালী মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)

বাবা, তুমি সবার সেরা আমার প্রথম ফ্রেণ্ড,
আমার জন্য আমার মনে রয়েছে অধিক প্রেম।
তোমায় ছাড়া থাকতে আমি পারি নাকো একা,
তোমায় দেখে মনে হয় যেন পেয়েছি ঈশ্বরের দেখা।
তুমি ছাড়া আমায় এত বাসবে না ভালো কেউ,
তোমার কাছেই পেয়েছি আমি সবার সেরা স্নেহ।
তোমার হাতে হাত রেখেই তো শিখেছি আমি হাঁটতে,
প্রেম প্রীতি দিয়ে শিখিয়েছো যে নতুন করে বাঁচতে।
দুঃখের সময় যখন কেউ ছিল না মোর পাশে,
ছায়ার মতো ছিলে তুমি আমায় ভালোবেসে।
যখন আমি ছিলাম ছোট পারতাম নাকো পড়তে,
তখন তুমি শিখিয়েছো মোরে অ-আ-ক-খ লিখতে।
কখনো আমার চোখ দুটি যদি ভাসতো নয়ন জলে,
তখন তুমি আদর করে তুলে নিতে কোলে।
তাই তোমায় নিয়ে বললো কিছু, করলে পরিহাস,
থাকবো নাকো চুপটি করে করবো প্রতিবাদ।
বাবা তুমি সারা জীবন সুস্থ সবল থাকো,
এমনি করেই হাতটি তোমার আমার মাথায় রাখো।

◆

মা তুমি এসো ফিরে

অর্ঘ্য সাহা (দ্বিতীয় বর্ষ)

মা তুমি এসো ফিরে
রাখবো তোমায় বুকে ধরে
তোমার কোলে মাথা রেখে
দেখবো তোমায় নয়ন ভরে।
মা তুমি এসো ফিরে
আত্মা আমার যাচ্ছে ফেঁটে
তোমার মতো বাবাই বলে
ডাকে না কেউ প্রাণ খুলে
মা তুমি এসো ফিরে
কথা বলবো তোমার সাথে
তোমার সব অব্যক্ত কথা
ব্যক্ত করে বলো আমাকে
মা তুমি এসো ফিরে
রাগ করো না আমার উপরে
তোমার চরন তলে মাথা রেখে
প্রনাম করবো বারে বারে।

•

নতুন বছর

সোহম মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)

নতুন বছর নতুন বছর
নতুন নতুন আশা।
নতুন বছরে নতুন করে
খুশির জোয়ারে ভাসা।
নতুন বছর নতুন বছর
নতুন করে উদ্দীপনা।
নতুন বছরে জীর্ণ শীর্ণ পুরাতনের
ঘুচবে সকল বেদনা।
নতুন বছরে আলোর জোয়ারে
ঘুচবে সকল অধিকার।
নতুন বছরে মনের বাসনা
পূরণ হোক সবার।

•

পরিবেশ দূষণ

অর্জুন গরাই (প্রথম বর্ষ)

আমাদের এই পরিবেশ ছিল আগে কত সুন্দর
সকাল বেলায় পাখির গানে হতো পরিবেশ মুখর।
ছিল চারিদিকে গাছপালা আর মিষ্টি ফুলের গন্ধ
রাত্রি বেলায় সবার ঘরে হত দরজা বন্ধ।
সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জ্বেলে করত সবাই ঘর আলোকিত,
গোলাপ ফুলের গন্ধে হত পরিবেশ মুখোরিত,
চারিদিকে কলকারখানার ধোঁয়া আর যানবাহনের শব্দ
এইভাবে পরিবেশ হয়েছে দূষণ বদ্ধ।
চারিদিকে বয়ে চলেছে নর্দমার পচা জল
কী করে সামলাবো এই পরিবেশ দূষণ
দেখবো আবার হয়ে যাবে পরিবেশ আগের মতো নির্মল।

•

জীবন মানে বিশ্বময়

— অসীম কুমার মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)

জীবন যা চাই তা কি সবই পায়
তা পায় না।
যা পায় তা খুবই অল্প।
তা বিশ্বের কাছে এক বিন্দুমাত্রিক।
তাহলে কি হবে, সময়কে ব্যর্থ করে
এই ব্যর্থ কি মান রাখবে বিশ্বের কাছে।
তুমি যখন হবে বিশ্বের এক নতুন ফল উদ্যান কারী
তখন তোমার এই ব্যর্থ সফল হবে
তা ছাড়া নয়।
তাকি সবাই পারে, তা সবাই পারে না।
আর তা না পারলে বিশ্বকে আমরা কি দিলাম।
কিন্তু তার বিনিময়ে বিশ্বের কাছে থেকে আমরা
অনেককিছু গ্রহণ করি।
অনেকে তার মর্যাদাও সঠিকভাবে দিতে পারে না।
এতেই কি জীবন স্বার্থ আমি তা জানি না।
আমি চাই বিশ্বের এক নতুন মুখ
যা বিশ্বকে উন্নতির থেকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে।
আর যে বা যারা নিয়ে যাবে -
তার এই জীবন সার্থক ও বিশ্বময়।

•

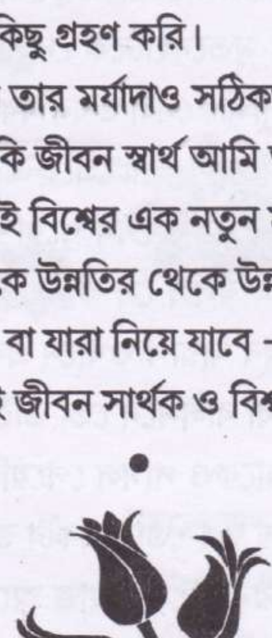

প্রিয় খেলা ফুটবল

— আবির পরামানিক (দ্বিতীয় বর্ষ)

"রক্তে তোমার ফুটবল
শিরায় ও ধমনীতে।
হারলে আমার হৃদয় কাঁদে
আর জিতলে আমরা
আনন্দে উঠি মেতে।
সবার সেরা দেশের সেরা
সেরা ফুটবল খেলা।
আবেগে আছে ফুটবল
অনুভূতিতে আছে ফুটবল
প্রাণের চেয়ে প্রিয় আমার
প্রিয় ফুটবল খেলা।
ইহলোক ছাড়বো যেদিন
করবো সব ত্যাগ
বুকের ওপর রেখা
প্রিয় খেলা ফুটবলের নাম"।

•

500 টাকার বাজি

অমিত চৌধুরী (দ্বিতীয় বর্ষ)

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় আমরা তিন বন্ধু আমি, রাম ও রবি আমাদের হাইস্কুলের গ্রাউণ্ডে বসে আড্ডা দিতাম। সেদিন আমি একটু তাড়াতাড়ি গ্রাউণ্ডে চলে আসি কিন্তু তখনও রবি ও রাম আসেনি। আমি গ্রাউণ্ডে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম, শীতের সন্ধ্যা তাই চারিদিক ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল আর কালকের বিকেলে বৃষ্টি হওয়াই শীতটাও ছিল প্রবল। অপেক্ষা করতে করতে ভাবলাম আজ আর হয়ত ওরা কেউ আসবে না তাই আমি বাড়ি ফিরতে সাইকেলে চড়েছি এমন সময় দেখি রবি আসছে, আমি সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়ালাম। রবি এসে বলল- অমিত, একটা খবর শুনেছিস ? আমি বলি কী খবর আমি তো কিছু শুনিনি। তখন দেখি রাম এইদিকেই আসছে। রাম ছিল খুব সাহসী সে ভূত ভগবান কিছুই বিশ্বাস করত না। সে এসে জুটতেই, রবি বলল জানিস কালকের বিকালের বৃষ্টিতে রাইপুর যাওয়ার রাস্তায় জঙ্গলের ভিতরে একটি মানুষ মারা গেছে। আমি বলি সে কী রে? আমি তো কিছু শুনিনি। রাম বলে তুই শুনিসনি আমি তো সকালেই বাবার কাছে ঘটনাটা শুনলাম। তখন রবি বলে উঠে তারপর শুন, ভোরবেলায় যখন রাইপুরের কিছু লোক সবজী নিয়ে বাজারে আসছিল তারা মৃতদেহটিকে দেখতে পায়। বাজারে এসে তারা সবাইকে সবকিছু বলে। যখন সেই জায়গাকে পুলিশ গেল তখন সকাল ৯টা, পুলিশ গিয়ে দেখে এক আশ্চর্য ঘটনা, মৃতদেহটির পুরো শরীর ফ্যাকাসে হয়ে গেছে এবং পুরো শরীরে ক্ষত-বিক্ষতের দাগ, শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই মনে হচ্ছিল কেউ যেন পুরো রক্ত চুষে নিয়েছে। এই কথাটা শুনে আমার পুরো শরীর শিউরে উঠে। রাম বলল সে কী করে সম্ভব? হঠাৎ রবি বলে আমি লোকের মুখে শুনলাম নাকি ওই জায়গাটি খুব খারাপ ওখানে একটি নিম গাছ আছে সেখানে নাকি ডাইনি বাস করে। রাম বলে যা -তা কথা বলিসনে তো ডাইনি বলে কিছু হয় না, তুই ও যেমন শুধুতেই ভয় খেয়ে যাস সেই রকম আমাকেও পাগল পেয়েছিস কী? রবি বলে তোর যদি, অতই সাহস তাহলে আজ রাত ১২টার সময় তুই তোর একটা জামা ওই নিম গাছে রেখে আসবি। আমি বললাম ফালতু ওইসবের কিছু দরকার নেই আজ অনেক গল্প হয়েছে এবার বাড়ি চল। রাম বলে অমিত তুই চুপ করে থাক আজ রবি যে ফালতু বলছে তা আমি প্রমাণ করেই ছাড়ব। রাম রবি কে বলে যদি নিম গাছে আমার জামা রেখে আসি তাহলে তুই কি দিবি বল? রবি কিছুক্ষণ ভেবে সেও বলে উঠে যদি রেখে পরের দিন আমাদের দেখাতে পারিস তাহলে আমি তোকে ৫০০ টাকা দেব। আমি বলি সেই সবের কিছু দরকার নেই এখন কী

হতে কী হবে। তারা আমার কথা না শুনে দুজনেই ৫০০ টাকার বাজি ধরে এবং আমাদের কথা হয় যে সকালে সেখানে আমরা দেখতে যাব। তারপর যে যার বাড়ি চলে আসে। সকালবেলা আমি ও রবি রামের বাড়ীতে যাই তাকে ডেকে নিয়ে যেতে। সেখানে গিয়ে শুনি রাম রাতে বাড়ী ফিরেনি। এই কথা শুনে আমি ও রবি দ্রুত সেই নিমগাছের কাছে আসি সেখানে দেখি রাম অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আমরা রামের জ্ঞান ফিরায়, তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করি রাতে কী হয়েছিল। সে বলে যে জামাটা রাখতে আমি নিম গাছের কাছে আসতেই একরকম শীতল বাতাস চারিদিক থেকে বয়ে আসে এবং আমি সাইকেল থেকে পড়ে যায় তারপর আর কিছু মনে নেই। আমি বলি ঠিক আছে বাড়ি চল তোকে বাড়িতে সবাই খোঁজা-খুঁজি করছে। রবি বলে এই নে বাজির ৫০০ টাকা। আর কোনোদিন এমন বাজি লাগাসনে যাতে করে প্রাণ সংশয় ঘটতে পারে এই বলে আমি, রাম ও রবি যে যার বাড়ি ফিরি।

●

* * *

"চলে যাব — তবু আজ যতক্ষন দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপনে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি —
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।" — সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

ভেবে অবাক

উজ্জ্বল কুমার পতি (প্রথম বর্ষ)

আজ থেকে দুই বছর আগে টেনে পড়ি। টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। সামনে মাধ্যমিক। মাথায় অনেক চিন্তা হচ্ছিল কোন বিষয়টায় কীভাবে লিখবো। কীকরে সারা বইটা রিভাইস দেবো। তারপরে নোট করা। টেস্ট পেপারগুলো সল্‌ভ করা। কত চিন্তা। খাওয়া দাওয়ার সময় পর্যন্ত নাই। এখনও মনে পড়ে তখন পড়তে পড়তে খাবার সময় পেতাম না। দুপুর তিনটায় স্নান করতে যেতাম। রাত গভীর হয়ে যেতো পড়তে পড়তে। নিশুতি রাতে একা একা পড়তে ভয় লাগতো আর রাত্রে গ্রামের রাস্তায় কুকুর ডাকতো। আর বাড়ির পিছনের জঙ্গল থেকে শিয়ালের ডাক শোনা যেত।

অবশেষে যথারীতি মাধ্যমিক পরীক্ষা চলে এলো। প্রতিদিন বাবার সাথে বাইকে করে পরীক্ষা দিতে যেতাম। পরীক্ষার সেন্টার পড়েছিল বাড়ি থেকে ১৫কিমি দূরে “সিমলাপাল” স্কুলের নাম “সিমলাপাল মদনমোহন উচ্চ বিদ্যালয়।” আমি পরীক্ষা দিতে স্কুলে ঢুকে পড়তাম আর বাবা বাইরে বসে থাকতেন। যাই হোক সব পরীক্ষা-ই ভালো হয়েছিল। সবথেকে ভালো হয়েছিল জীবন বিজ্ঞান এবং ইতিহাস। আর ভৌত বিজ্ঞানটা একটু কম ভালো।

পরীক্ষা শেষ, এবার নিশ্চিন্তে ঘুরতে যাওয়া। যখন রেজাল্ট বেরোলো -ফাস্ট ডি ভিশন।

যদি এখনকার সময়ে মাধ্যমিক দিতাম তা হলে এমন হতো না। ফোন টা নিয়ে বসতাম। পড়তে গিয়ে টুরুং করে ম্যাসেজ আসতো আর পড়া হতো না। ফোনে কতক্ষণ এ দেখবো ম্যাসেজ তার জন্য মনটা উসখুস করতো।

তখন কিভাবে যে পড়ায় মন বসাতাম কে জানে, এখন আমি তো ভেবেই অবাক হয়ে যাই।

●

* * *

" Our sweetest songs are those
that tell of saddest thoughts." **— P.B. Shelly**

গল্পের বই

কোশিক ঘোষ (প্রথম বর্ষ)

একদা অমৃতপাড়া নামে এক গ্রাম ছিল সেখানে একটি ছোট ছেলে সোহম তার বাবা মার সাথে থাকত। সে খুব সৎ ও পরিশ্রমী ছিল। হঠাৎ একদিন তার বাবার খুব বড়ো একটা অসুখ হল। তার পরের দিন সোহম তার বাবাকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার দেখে পরে বলল তোমার বাবা আর বাঁচবে না। তার ঠিক দুই দিন পর তার বাবা মারা গেল। যেহেতু তারা গরীব তাই সে তার মা এর সাথে খুব কষ্টে দিন অতিবাহিত করত। তারপর সে ভাবল যে আমাকে কিছু একটা করতে হবে। তাই সে বাজারে গিয়ে নানা রকমের গল্পের বই কিনে আনত। সে রোজ সকালে একগাদা বই ঝুলিতে ভরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকত। বইগুলো এত ভারি ছিল যে সে ঘামত। সে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলিকে জিজ্ঞেস করত 'বই নেবেন দাদা' নতুন নতুন নানা রকমের গল্পের বই, যে কোনো বাস এসে দাঁড়ালে সে সবার আগে উঠে পড়ত এবং বাসে সবাইকে জিজ্ঞেস করত 'বই নেবেন দাদা, নতুন গল্পের বই। দাম ও খুব কম। সারাদিন সোহম এইভাবে বলত আর বাসে বাসে ঘুরত। এইভাবে সে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াত। এছাড়াও লোকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বলত বই নেবেন নতুন নতুন গল্পের বই। আমাদের সাথে মাঝে মাঝে দেখা হলে কথা বলত। যে কোনো বই দেখলে নাম বলে দিত। আবার লোকে যে বইয়ের নাম বলতো ও তার ঝুলি থেকে সেই বই আমাদের বার করে দিত। সোহমের সব বইয়ের নাম মুখস্ত ছিল। সোহম রাতে বাড়ি ফিরে নিজের ঝুলি থেকে বইগুলি বার করে পড়ত। তবে সে কোনোদিন স্কুলে যায়নি। সে তার মা এর কাছে পড়াশোনা করত। সোহম চায় বড় হয়ে একটা খুব বড়ো বইয়ের দোকান করবে।

◆

"অমি যতো দূরেই যাই
আমার সঙ্গে যায়
        ঢেউয়ের মালা গাঁথা
এক নদীর নাম —
        আমি যতো দূরেই যাই
আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
        উঠোনে সারি সারি লক্ষ্মীর পা
আমি যতো দূরেই যাই।"   — সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দাদুর মুখে শোনা মাসি বাড়ির ভৌতিক কাহিনী

আকাশ পতি (প্রথম বর্ষ)

যে কাজ যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না বা যে কাজ আশ্চর্য-জনক ভাবে ঘটে তাকে ভুতুড়ে কাণ্ড বলে। আমি আকাশ। আমি আজ তেমনই একটি ভুতুড়ে গল্প নিয়ে আলোচনা করব।

আমি তখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। তখন আমি প্রায় ছোটো। তখন ভুতুড়ে নামটা শুনলেই আতঙ্কে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যেত। একদিন খুব হালকা বৃষ্টি পড়ছে ঠিক তেমন সময় আমার দাদু শ্যামাপদ পতি একটি ভৌতিক কাহিনি শুরু করলেন। আমার দাদু খুব রসিক মানুষ। তিনি প্রায়সই নানা গল্প করেন। কিন্তু এই গল্পটি ছিল একটু আলাদা। কারন এটি তার জীবনে ঘটে যাওয়া এক সত্যিকারের ভুতুড়ে কাণ্ড। গল্পটি ছিল এরকম — আমার দাদু সবে তার স্কুলের ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে ছুটিতে মাসির বাড়ি যান। তিনি সেখানে সপ্তাহ দুয়েক থাকবেন। দাদুর মাসির ৩ ছেলে। একজন অফিসে কাজ করেন বলে বিদেশে থাকেন। বছরে ২ থেকে ৩ বার বাড়ি আসেন এবং বাকি দুজন বাড়িতে থাকে। ছোটো মাসতুতো ভাই সদ্য মাছের ব্যবসা চালু করেছেন। বাড়িতে বলতে মাসি, মেসো ও ২ ভাই। এভাবেই মাসিবাড়িতে দাদুর প্রায় ৩ দিন থাকা হয়েছিল। তখনো সব ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু এরপর সেই ভৌতিক কাণ্ড শুরু হল।

একদিন ভোরে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল এবং ছোটো ভাই প্রায়ই ভোর বেলা মাছ কিনতে নদীর তীরে যান। সেদিনও তিনি ছাতা ও সাইকেল নিয়ে মাছ ব্যবসায় বেরিয়ে পড়েন। দাদুর মাসি তার ছোটো ছেলেকে অনেক বারণ করেন। কিন্তু সে কোনো কথা না শুনে ছাতা ও সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। এর কিছুক্ষণ পর প্রচণ্ড জোরে বিদ্যুৎ চমকায়। তারপর সারা দিনে দাদুর ছোটো ভাইয়ের দেখা নেই। এদিকে দাদুর মাসি কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছেন এবং তার ছেলের বাড়ি ফিরে আসার পথ চেয়ে বসে আছেন। অবশেষে সারা শরীরে কাদা মাখা হয়ে কপালে এক প্রকাণ্ড ক্ষত নিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরলেন। দাদুর মাসি তার ছেলেকে দেখে প্রকাণ্ড কান্না শুরু করলেন এবং জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন যে সে এতক্ষণ কোথায় ছিল। দাদুর ছোটো ভাই একটু বিরক্তির স্বরে উত্তর দিলেন "ও! এখন কি করছ। ছাড় আমাকে।" এই বলে তিনি বাড়ির ভেতর চলে গেলেন। এরপর থেকে ভাই আর মাছের ব্যবসায় যান না। এবং একটু মনমরা হয়ে চুপচাপ বসে থাকেন। দাদু সর্বদা তার ছোটো ভাই এর সাথেই রাত্রিতে শুতেন।

হঠাৎ একদিন দাদু দেখেন যে তার ভাই খাটে শুয়ে নেই। তিনি ঘড়ি দেখে জানেন যে ২ টো বাজে। তারপর ফাঁকের দিক থেকে এক ভয়ানক আওয়াজ আসছিল। দাদু ভয়ে ভয়ে জানালার

পর্দা সরিয়ে এক ভয়ানক কাণ্ড দেখেন। তিনি দেখেন যে তার ছোটো ভাই উঠনে বসে প্রকাণ্ড একটা হাত বাড়িয়ে পেয়ারা গাছে পেয়ারা তুলে নিয়ে আসছে। দাদু অবাক! একটা মানুষের এত বড়ো হাত হয় কী করে? এরপর দাদু চুপচাপ তার মাথার ঘাম মুছে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। পরের দিন সকালে উঠে দেখেন যে তার ছোটো ভাই দিব্যি তার খাটে ঘুম দিচ্ছে। তখন তিনি ভাবলেন যে তিনি কাল রাতে যা দেখেছেন তা তার মনের ভুল।

এরপর দ্বিতীয় দিনে দাদু একটু ভয়ে থাকার কারনে ঘুম আসছিল না। এদিকে তার ছোটে ভাই দিব্যি ঘুমাচ্ছিল। এরপর দাদুর একটু চোখ লাগতে না লাগতেই আবার সেই শব্দ। এবার সেই শব্দটা বাইরের দিক থেকে নয় বরঞ্চ ঘরের ভিতর থেকে আসছিল। দাদু খুব ভয়ে ভয়ে তার চোখ খুলে মোমবাতির মৃদু আলোতে দেখেন যে তার ছোটো ভাই প্রকাণ্ড এক শরীরে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন। খাট থেকে তার পা মাটিতে পড়ে আছে। একটা সাধারণ মানুষ হঠাৎ করে এত বড় হলো কী করে। এটাও তার মনের ভুল বলে চোখ ঘসে দেখেন যে তিনি যা দেখছেন তা মোটেও ভুল নয়। এরপর তিনি নিশ্চিত যে এটা তার ছোটো ভাই নয়। এ কোনো প্রেতাত্মা। এরপর পরের দিন সকালে দাদু পরীক্ষা করে দেখবেন বলে স্থির করেন। দাদু ও তার বাবার কাছে শুনেছেন যে ভুতের কখনো ছায়া পড়ে না। এরপর সকালে তার ভাই যখন উঠনে বসে আছেন তখন তিনি লক্ষ্য করেন এ কী! সত্যি তার ছোটো ভাইয়ের কোনো ছায়া মাটিতে নেই। এরপর দাদু তার পিসিকে দুদিনের রাতের কথা খুলে বলেন এবং প্রমাণ হিসাবে তার ভাইয়ের ছায়া ও কপালের ক্ষতস্থানটা দেখতে বলেন। যা ৫দিন পরেও ঠিক হয়নি। একই রকম আছে। এরপর তিনি তার পিসিকেও বিশ্বাস করান।

তার পিসি তার সেজো ছেলেকে সব কথা খুলে বলেন। তার সেজো ছেলের কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না বলে পরের দিন রাত্রিতে দাদু ও তার মেজো ভাই একসাথে তার ছোটো ভাইয়ের সাথে শুয়ে থাকেন। সেই রাত্রিতে সেই একই কাণ্ড। মাঝরাত্রিতে দেখা যায় দাদুর ছোটো ভাই বিছানায় নেই এবং দর্জা ভিতর থেকে বন্ধ। তখন দাদু ও দাদুর মেজো ভাই দুজনে দরজা খুলে বাইরে এসে দেখে যে ছোটো ভাই গাছের ডালে প্রকাণ্ড এক শরীরে বসে কাঁচা মাংস চিবিয়ে খাচ্ছে এবং তার হাড় ছুড়ে দিচ্ছে নানা দিকে। সেই একটি হাড় এসে দাদুর পায়ের কাছে পড়ে। দাদু তার দিকে তাকিয়ে দেখেন যে সে একদম তাজা রক্ত। এই দেখে তাদের বিশ্বাস হয়ে যায় যে তাদের ছোটো ভাই কোনো প্রেতাত্মাতে পরিণত হয়ে গেছে।

এরপর সকাল বেলা দাদুর পিসির নির্দেশ মতো পাশের গ্রামে ভৈরব তান্ত্রিককে ডেকে আনেন মেজো ভাই। তারপর তান্ত্রিক এসে নানা মন্ত্র পড়ে বুঝতে পারেন যে এখানে একটা আত্মা ঘুরে

বেড়াচ্ছে। তখন তিনি একটি হোম যজ্ঞী করার পরিকল্পনা নেন। হোম শুরু হতেই তান্ত্রিক একটি বালিভর্তি হাঁড়িতে ঝেটার বাড়ি মারতে লাগলেন। তখন সেই যন্ত্রনায় তার ছোটো ভাইয়ের ভেতরের প্রেতাত্মা চেচিয়ে ওঠে। এরপর তান্ত্রিক জিজ্ঞাসা করেন যে তুই কে ও কী ভাবে এর শরীরে এলি। তখন সেই আত্মা এক ভয়ানক খনা গলায় উত্তর দেয় "আমি হলাম নাড়ু নাপিতের বৌ। আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি। যারা আমাকে অপঘাতে মেরেছে তাদের আমি ছাড়ব না"। এরপর তান্ত্রিক বলেন যে "তুই এর শরীরে এলি কী করে?" তখন সে উত্তর দেয় "সেদিন ভোরে ওর মাথাতে বজ্রপাত পড়ে তারপর সে মারা যায়। আর আমি সেই সুযোগে ওর শরীর নিয়ে নিই।"

তারপর তান্ত্রিক বলেন যে তুই ওর শরীর ছেড়ে দে। তখন সেই আত্মা বলে যে না আমি এর শরীর ছাড়ব না। এরপর তান্ত্রিক প্রচণ্ড স্বরে চিৎকার করতে থাকেন। নানা তন্ত্র মন্ত্র বলে ওই আত্মাকে বিরক্ত করতে থাকে। অবশেষে ওই আত্মা দাদুর ছোটো ভাই এর শরীর ছেড়ে চলে যায়। এবং সেই স্থানে পড়ে থাকে দাদুর ছোটো ভাইয়ের মৃত অসাড় দেহ।

এরপর দাদু তার ছোটো ভাইয়ের সৎকার্য করে পরে বাড়ি ফিরে আসেন।

এই ছিল আমার আজকের কাহিনী। কেমন লাগলো তা আমাকে তোমরা জানাবে।

●

* * *

" There is no future in any job, the future lies in the man who holds the job"

— G.W. Crane

নিঝুম রাতে ভূতের সাথে

সুমন বাউরী (প্রথম বর্ষ)

রাত তখন সাড়ে এগারোটা। আমি ঘরে জানলার পাশে বসে বসে সংস্কৃতের ‘ফল’ শব্দরূপটি মুখস্ত করছিলাম। “ফলম ফলে ফলানি, ফলম ফলে ফলানি।” বাড়ির বাকি সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। আর আমার কদিন পরেই পরীক্ষা বলে অনেক রাত অব্দি জেগে পড়া মুখস্ত করছিলাম। পড়তে পড়তে আমার মনে হল, আমার সঙ্গে আরেকজন গলা মেলাচ্ছে। যেন, আমি পড়তে শুরু করলেই, সেও আমার সঙ্গে পড়ছে। আমি তাড়াতাড়ি পড়া বন্ধ করে শোনার চেষ্টা করলাম কে বলছে। কিন্তু আমি পড়া থামাতেই সেও থেমে গেছে। আমি ঘরের চারিদিকে দেখি। না, কেউ কোথাও নেই, পাশে ভাই আর বোন ঘুমে একেবারে বেঘোর। তাহলে কে কথা বলছিল। পরক্ষণে মনে হলো হয়তো আমারই শোনার ভুল। এই ভেবে মনকে শান্ত করে আবার পড়তে শুরু করলাম। যেই না পড়তে শুরু করেছি, অমনি আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে ‘সে’ ও পড়তে শুরু করল। আমি তো অবাক, এটা কি করে হয়? কে আমার এমন অনুকরণ করছে? আমি ভাবলাম ও’ কি বলছে? আমি যা বলছি তাই বলছে নাকি অন্য কিছু বলছে? আমি শোনার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমি কিছু না বললেও সেও কিছু বলছে না। তাই আমি আস্তে আস্তে আবার পড়া শুরু করলাম। পড়তে শুরু করলেও আমার মন ও কান দুইই ওই অদ্ভুত জিনিসটির দিকে ছিল। কিছুক্ষণ ধরে মনোযোগ সহকারে শোনার পর বুঝতে পারলাম সে আসলে বলছে —“ভূতুম ভূতে ভূতানি, ভূতুম ভূতে ভূতানি”। আমি পড়ছি “ফলম ফলে ফলানি,” আবার সে বলছে “ভূতূম ভূতে ভূতানি”। আমার কাছে সবকিছুই ক্রমশ যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল। একবার আমার মনে হলো কেউ আমার সঙ্গে মজা করছে না তো। আবার ভাবলাম এই রাতদুপুরে কনকনে শীতে কার এই মজা করার ইচ্ছা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। না না এই হাড়কাঁপানো শীতে কেউ মজা করতে পারবে না। তাহলে? তাহলে কে হতে পারে? হঠাৎ আমার ‘ভূত’ শব্দটার কথা মনে পড়ে গেল। এই শব্দটা মনে হতেই আমার শিরদাঁড়া বেয়ে রক্তের একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। তাহলে কি ভূত? না না ভূত হতে পারে না। বাবা বলেন ভূত বলে কিছু হয় না, ওটা স্রেফ মানুষের কল্পনা মাত্র। যদি না এটা ভূত-টুত হয় তাহলে আসলে ব্যাপারটা কী? একবার দেখলেই এখুনি সবকিছু জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এই ভেবে বিছানা থেকে নেমে গুটি গুটি পায়ে, ছোটো টর্চ হাতে নিয়ে দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এলাম। এসে দেখি চারিদিক অন্ধকার, কেউ কোথাও নেই। আমি চারিদিকে দেখার চেষ্টা করছিলাম কোনদিক থেকে শব্দটা আসছিল। হঠাৎ দেখি সজনে গাছের নীচে, পেয়ারা গাছের

ডালে কী যেন একটা বসে আছে। আর হঠাৎ করে সেটা নড়ে উঠছে। ভয়ে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছিল। এত শীতেও আমার জামাটা পুরো ঘামে ভিজে গিয়েছিল। সে হলেও আমি একটু কাছে গিয়ে জিনিসটাকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এত অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না। আমার নিজের ভেতরের ভয় তাড়ানোর জন্য আবার ওই অদ্ভুতুড়ে জীবটার সম্পর্কে সন্দেহ দূর করার জন্য আমি জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম, "কেরে"?

সে বলে উঠল, "টেরে"?

আমি চমকে দুপা পিছিয়ে এলাম। আবার সাহস করে এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

"ওখানে কে"?

সে বলল, 'টখানে টে'?

এটা কী করে হয়। ভূত এভাবে মানুষের অনুকরণ করে নাকি? আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। ব্যাপারটা কী আমাকে জানতেই হবে। কিন্তু আমি ভাবতে পারছিলাম না আমি কি করবো। একবার ভাবলাম বাড়ির সবাইকে গিয়ে জাগাই। আরেকবার ভাবলাম না না আমাকেই কিছু করতে হবে। কাল সকালে সবাইকে তাহলে বড়াই করে বলতে পারব যে আমি রাত দুপুরে ভূত আবিষ্কার করেছি। হঠাৎ আমার হাতে ধরা টর্চটার কথা মনে পড়ে গেল। এতক্ষণ উত্তেজনায় ভুলেই গেছিলাম যে হাতে একটা টর্চ ধরে আছি। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলাম এত বেশি ভয় পাওয়ার জন্য আর সমস্যার সমাধান তো হাতেই আছে। টর্চটা জ্বালালেই তো বোঝা যাবে এই "অনুকরণকারী জীব" টি আসলে কী? তাই আর কিছু না ভেবে তাড়াতাড়ি টর্চটা জ্বালালাম। টর্চ জ্বালাতেই একটা সবুজ রঙের পাখি অর্থাৎ টিয়াপাখি ফড়ফড় করে উড়ে পালাল। বুঝলাম এতক্ষণ যেটাকে দেখে ভয়ে আমার দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হচ্ছিল সেটা আসলে লালুদের বাড়ির টিয়া পাখিটা। যেটা হয়তো কোনো কারণে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। ওটাকে আমি অনেকবার দেখেছি আর এও জানি যে কোনো কথা শুনলেই একটু অনুকরণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমি ওই "ভূতুম ভূতে ভূতানি" শুনে এত বেশি ভয় পেয়ে গেছিলাম যে আমার আর কিছুই মনে পড়েনি। যাক বাবা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে ওটা টিয়া পাখি ছাড়া আর কিছুই নয়। এরপর আমি ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে টর্চটাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে, সেটিকে যথাস্থানে রেখে বিছানায় শুতে গেলাম। ভাবলাম অনেক পড়া হয়েছে আর পড়ে কাজ নেই। টিয়াপাখিটাও চলে গেছে আর ডিসটার্ব করবে না। এই ভেবে আমি লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে কখন ঘুমিয়ে গেছি, কে জানে? চোখ খুলে দেখি শীতের টাটকা রোদে চারিদিকটা ঝলমল করছে।

●

অবশেষে

আয়েতুল্লা খান (প্রথম বর্ষ)

দুপুরের খাঁ খাঁ রোদে, সেই চিরচেনা মলিন জীর্ণ ইটপাথরের দেওয়ালকে আমি অতিক্রম করে আমি যাচ্ছি। জীর্ণ মলিন বললে ভুল হয়, ঠিক গ্রামের মাঝখানে যেখানে ছোটো ছোটো মুদিখানা, দু একটা মিষ্টি দোকানের পাশে একালের একটি অপরিস্কার লাইব্রেরি দাঁড়িয়ে আছে। তার চারপাশে কিছু আগাছা, লতা পাতা যেন লাইব্রেরিটিকে গ্রাস করবে। লাইব্রেরির এই অবস্থার কারণ হল করোনা কালে যখন গোটা বিশ্ব স্তব্ধ হয়েছিল ঠিক এই সময়ে আমাদের লাইব্রেরিটি বন্ধ হয়ে যায়।

রাস্তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে যেই লাইব্রেরি আমি স্মৃতিচারণ করছিলাম; এটি সেই গিরীধারিপুর মোজাফফর আহমদ গ্রামিন পাঠাগার। নামটি রাখা হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মোজাফফর আহমেদের নামে।

তখন আমি সদ্য কৈশোরে পা দিয়েছি; কিশোর মন যেন রাজা-রানি, রূপকথার গল্প আর পড়তে মন চাইছে না। বন্ধুদের মুখে শোনা টেনিদা, সুকুমার রায়ের পাগলা দাশু”র প্রতি আমার মনে প্রচণ্ড আকর্ষণ জেগে ওঠে। সপ্তম শ্রেণিতে দু একটা গল্প পড়ে আরও গল্প পড়ার ক্ষিদে বেড়ে যায়। বন্ধুরা সবাই লাইব্রেরি থেকে বিভিন্ন গল্প বই নিয়ে আসে, আমি শুধু চেয়ে দেখি।

তারপর আমার বন্ধু সামিম আমাকে একদিন বলল —

চল আজকে তোকে আমার সাথে গল্পের বই আনতে নিয়ে যাব। আমি তখন প্রচণ্ড খুশির সাথে তাকে বললাম চল তাহলে যাই। তারপর দুপুরবেলা আমরা লাইব্রেরির উদ্দেশ্যে চললাম।

লাইব্রেরিকে আমি বহুদিন রাস্তার পাশ থেকেই দেখেছি। আজ ভিতরে ঢোকার সৌভাগ্য আমার হবে। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম তাকে নানারকম বই আছে। মোটা, পাতলা ছোটো, বড়ো।

তারপর চেয়ারের দিকে আমার চোখ পড়ল —

এক ভদ্রলোক চশমা পরে, মাথায় যত্ন করে সিঁথি করা, পান চিবাচ্ছেন। আমাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে, যেন আমাকে পরখ করে নিচ্ছেন যে আমি এখান থেকে বই নেওয়ার যোগ্য কিনা। তারপর আমাকে প্রশ্ন করে -

বলতো লাইব্রেরির নাম কী?

আমি ভাবার পর বললাম, স্যার গিরীধারিপুর আহমদ গ্রামিন পাঠাগার।

লাইব্রেরির সম্পূর্ণ নাম বলতে না পারায় উনি আমাকে সামান্য তিরস্কার করে বলেছিলেন লাইব্রেরি নাম না জেনেই লাইব্রেরি থেকে বই নিতে এসেছো।

তারপর উনি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন

— তোমাকে এখন বই দেওয়া যাবে না, আমাদের এখন প্রচুর সদস্য। সারাদিন কতজন বই নিয়ে আসছে, জমা দিচ্ছে হিসাব রাখতে রাখতেই আমি হাপিয়ে উঠছি।

একথা শুনার পর আমার মন খারাপ হয়ে গেল - কিছুক্ষন অনুনয় করার পর অবশেষে তিনি আমাকে বই নেওয়ার অনুমতি দিলেন। অবশ্য অনেক নিয়ম কানুন আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে আমাকে বলল -

তুমি সর্বোচ্চ 'দুটি' বই নিতে পারো এবং 'পনেরো' দিনের মধ্যে ফেরত দিতে হবে, তা না হলে শাস্তির মুখে পড়বে। বই নেওয়ার সময় ছেঁড়া, কাটা, বইয়ের পাতা উল্টে দেখে - নিবে।

প্রথম দিনেই আমি টেনিদা আর সুকুমার রায়ের লেখা গল্পটি নিয়ে আসি।

কিছুদিন পর ভদ্রলোকের নাম জানতে পারলাম নিখিল কর্মকার। বেশ কড়া প্রকৃতির ছিলেন। বই ছেঁড়া, ফাঁটা দেখলে খুবই আঘাত পেতেন।

এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায় আমি লাইব্রেরি থেকে বিভিন্ন রকম বই নিয়ে আসি জমা দিয়ে আসি এইভাবে বেশ ভালোই চলছিল।

আমার একবার বই জমা দেওয়াতে বেশ কিছুদিন দেরি হয়। তারপর লাইব্রেরিতে বই জমা দিতে যাওয়ার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করে — বই জমা দিতে এত দেরি হল কেন?

- স্যার আমার শরীর খারাপ থাকায় আমি আসতে পারিনি।

- বই জমা দিতে দেরি হলেই তোমাদের সেই একই অযুহাত। এই রকম চলতে থাকলে তোমাকে আর বই দেওয়া হবে না। কথাটা যেন মাথায় থাকে।

তারপর একদিন শুনলাম তিনি অবসর নিয়েছেন তার জায়গায় একজন নূতন ঢুকেছেন। এইভাবে নানা ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটছিল। একদিন হঠাৎ শুনলাম ভদ্রলোক ক্যানসারে মারা গেছেন। শুনে অতীতের নানা স্মৃতি মনে করে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তারপর থেকে লাইব্রেরিটা বন্ধ হয়ে গেছে। অপরিস্কার অবস্থায় রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

●

"জিজ্ঞাসা করো না দেশ তোমার জন্য কি করিয়াছে,
জিজ্ঞাসা করো তুমি দেশের জন্য কি করিয়াছো" — জন এফ. কেনেডি

একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ

অঙ্কিত দত্ত (প্রথম বর্ষ)

ভ্রমণ মানে অচেনাকে চেনা, অজানাকে জানা। আর সেই ভ্রমণ যদি হয় বন্ধুদের সঙ্গে এবং সঙ্গে থাকেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং তাদের নির্দেশক ও সাহচর্য — তাহলে তো আর কোনো কথায় হয় না। কিছুদিন আগে এরকম একটি ভ্রমণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার যা ছিল এক শিক্ষামূলক ভ্রমণ।

ঐতিহাসিক স্থানের কথা শুনলেই যে জায়গাটা প্রথমেই মনে আসে তা হল মুর্শিদাবাদ। যেখানে জড়িয়ে আছে নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লা ও বাংলার নবাবের বিভিন্ন স্মৃতি এবং তাদের ব্যবহৃত নানাবিধ সরঞ্জাম। ইতিহাস যেন জ্যান্ত ঘুরে বেড়াই সেখানে।

মা-বাবার কাছে সম্মতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম ২৬শে ডিসেম্বর, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে। আমার সঙ্গে ছিল আরো তিনজন বন্ধু, সবাই মিলে কিছুটা হেঁটে বাসস্ট্যাণ্ডে গেলাম। সেখানেই দাড়িয়েছিল বাস। যেয়ে দেখলাম অন্যান্য বন্ধুরা সবাই বসে আছে এবং স্যার জিনিস বাগাচ্ছে। আমরা সবাই মিলে ছিলাম মোট ৬২ জন এবং সাথে রাঁধুনি ও ৩ জন স্যার। সবাই বাসে বসে আছি স্যারদের নির্দেশ বাস ছাড়বে ৮.৩০ এ। আমাদের কৌতূহল বেড়ে যায়। আমাদের আনন্দ তখন দেখে কে - 'পাখি যখন প্রথম আকাশে উড়তে শেখে তখন সেইরূপ আনন্দ হয় পাখির সেইরূপ আনন্দ আমাদের মুখে।' ঘড়িতে ৮.৩০ বাজলো, উৎসাহের সহিত সেখান থেকে বাস ছাড়লো এবং যাত্রা হলো শুরু। সারা রাত্রি কেটে যাবে সেখানে পৌছাঁতে। ফলে দূরত্ব অনেক। আর দূরত্ব যখন অনেক মজাও তখন দ্বিগুন।

আমি ছিলাম প্রকৃতিপ্রেমী। তাই জানালার ধারের সিটটা বেঁছে নিলাম। পাশে ছিল আমার বিশেষ বন্ধু। ঠিক ভোর বেলাতেই মুর্শিদাবাদে পৌছাবো। আর এখন বাসের মধ্যে চলছে হল্লা, গান, নাচ। কিছুক্ষণ সবাই আনন্দ করলাম। তারপর সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কেও মোবাইল ঘাটতে শুরু করল। কেউ আবার ঘুমোতে লেগে গেল। আমার পাশে থাকা বন্ধুটিও মোবাইল ঘাটতে শুরু করল। আর আমি ফোনে গান লাগিয়ে উপভোগ করতে লাগলাম প্রকৃতিকে। আমার মতে বাইরের দৃশ্য দেখে যা মনে আছে তা মোবাইলের মধ্যে নেই।

'মজা গন্তব্যে নয় গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছানোর রাস্তাতে থাকে।'

সবাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমি এক টুকু ও ঘুমোয়নি, সারা রাস্তা দেখে দেখে আসছিলাম। ব্রীজ, টোলট্যাক্স ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশেষে গন্তব্যের দিকে এলাম।

ঠিক ভোর ৪টা। পৌঁছালাম মুর্শিদাবাদে। আমাকে হতবাক করে দিয়েছিল সেখানের ভোরের

দৃশ্য। সেখানে যা কুযাশা ছিল তা আমাদের গ্রামের থেকে ৩গুন বেশী। ঠিকমতো কোনো কিছু দেখাই যাচ্ছিল না। কুয়াশাচ্ছন সেই রাস্তা ভেদ করে ছুটে আসছিল ঘোড়া। কুয়াশাচ্ছন্ন ভোর, লোকজন সেইরকম নেই। ছুটে চলেছে ঘোড়া। তাদের খুরের আওয়াজ কানে আসছিল প্রতিনিয়ত। সেখানে পিকনিকের জন্য কোনো ফাঁকা মাঠ ছিল না। তাই সামনেই দেখলাম একজন মহিলা দস্তানা গোটাচ্ছে, সে ঘর ভাড়া দেয় পিকনিকের জন্য। স্যারেরা সেখানেই ঘর ভাড়া নিল। সেখানে গিয়ে ব্রাশ করে যতক্ষণ খাবার তৈরি করা হচ্ছিল ততক্ষণ ওই চারিপাশটা ঘুরে দেখতে বেরোলোম সব বন্ধু মিলে। ঘুরতে বেরোলাম। সামনেই দেখলাম গঙ্গা নদী বয়ে চলেছে এবং সেখানে ২জন পুরুষ স্নান করছে যেখানে আমরা শোয়েটার জামা-টুপি পরে থরথর করে কাঁপছিলাম। সেই সময় লোক ছিল না দোকানের দোকানদাররা বসে ছিল দোকান খুলে। একটু ঘুরে ফিরে গেলাম। সেখানেই কিছুটা সময় পার করলাম এবং প্রায় ৯টার দিকে। খাওয়া দাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়েছিলাম বিভিন্ন স্থান দেখতে। স্যারেরা আমাদের দলে ভাগ করে দিল এবং ঠিক বিকাল ৫টার মধ্যে ঘুরে আসতে বলল এই ঘরের সামনে। আমাদের সাথে ছিল ২২জন বন্ধু এবং স্যার। কেউই ঘোড়াই চড়েনি কখনো এবং ভাড়াও বেশী বলছিল তাই সুবিধা দেখে স্যার বললেন টেটো ভাড়া করতে। শেষে টোটোতেই বেরোলোম ঘুরতে।

ভারতবর্ষের ঐতিহ্যময় স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ। নবাব সিরাজদ্দৌলা এবং অন্যান্য নবাবদের জীবনের ইতিহাস ফুটে উঠেছে মুর্শিদাবাদে।

মুর্শিদাবাদের সেরা দর্শনীয় স্থানের নাম যার জন্য মুর্শিদাবাদ বিখ্যাত তা হল হাজারদুয়ারি। এতে ১০০০টি দরজা দেখতে পাওয়া যায়। তাই এইরূপ নামকরণ। তার মধ্যে স্যার আমাদের জানালো যে এখানে ১০০টি দরজা নকল যা শত্রুদের বিভ্রান্তির জন্য। এর ভেতরে গেলে দেখতে পাবে বিভিন্ন প্রকার আয়না, অস্ত্র-শস্ত্র, রুমের কারিগরি, মূল্যবান ধাতব প্রভৃতি। এবং এই প্রসাদের সামনেই বহুদূর লম্বা বিস্তৃত রয়েছে নিজাম ও ইমামবাড়া।

তারপর দেখতে গেলাম আজিমুন্নিসা বেগমের জীবন্ত সমাধি। এর পেছনের ইতিহাস সবচেয়ে ভয়ানক। স্যার আমাদের জানালেন কে আদিমুন্নিসা বেগম ছিলেন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ এর কন্যা যিনি একটি ব্যাধিতে ভুগছিলেন। এবং সেই ব্যাধি নিরাময় করতে সে প্রতিদিন নিস্পাপ শিশুর হত্যা করে তার কলিজা থেকে ঔষধ তৈরি করে খেতেন। এছাড়া সুস্থ হয়ে ওঠার পরও তিনি সেইরূপ করতে থাকেন। এই সকল দেখে নবাব তাকে জীবন্তভাবে কবর দেওয়ার নির্দেশ দেন। ওখানে গেলেই দেখতে পাবে তার সমাধি।

এছাড়া একটি স্থান হল কবরস্থান। সেখানে ২০ টাকা টিকিট করে ঢুকতে হয়। সেখানে

পরপর সজ্জিত অবস্থায় রয়েছে ১০৮টি কবর।

তারপরেই গেলাম জগৎশেঠের রাজবাড়ি। সেখানে দেখতে পাবে বিভিন্ন পূর্বে মহিলাদের ব্যবহৃত শাড়ি-খাবার চামচ-প্লেট, সুড়খা, অস্ত্র এছাড়া একটি বিশেষ আয়না যাতে পুরো শরীর দেখাবে কিন্তু মাথা দেখাবে না। এমনভাবেই সেটা রাখা রয়েছে।

এছাড়াও রয়েছে আরো বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান যেখান থেকে অনেক ইতিহাস দেখতে এবং শিখতে পারবে। এগুলি ছাড়াও আমরা ভ্রমণ করেছিলাম মোতিঝিল পার্ক। এটি ৩৫০ একর জায়গা নিয়ে গঠিত একটি পার্ক। এছাড়াও পশিপুর রাজবাড়ী এবং বিভিন্ন আরো জায়গা।

বন্ধুদের সাথে একসাথে ঘোরা, খাওয়া দাওয়া, বিভিন্ন জিনিস দেখা এবং তা নিয়ে নানাবিধ আলোচনা এইসবের মধ্যে সেই দিনটা কেটে গেল মুর্শিদাবাদে। অনেক কিছু অজানা তথ্য মস্তিষ্কে নিয়ে এবং স্মৃতিকে ক্যামেরা বন্দি করে রাত ৮টার দিকে রওনা দিলাম বাড়ির দিকে।

সেখানে জানলাম অনেক অজানা তথ্য, অচেনা দিক। স্মৃতিমধুর হয়ে থেকে যাবে সেই মুর্শিদাবাদ। সেখানের বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে জেনে জীবনের আলাদা একটা আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলাম।

●

চিরস্মরণীয় সেই ভ্রমণ

অচিন্ত্য পাল (প্রথম বর্ষ)

সালটা ছিল ২০২২। আমি তখন সাবড়াকোন বেসিক কলেজে পাঠ্যরত প্রথম বর্ষের ছাত্র। আমি তখন হোস্টেলে থাকতাম। আমার বন্ধুগুলো ছিল খুব ভালো। ভালো মানে পড়াশোনায় নয়। আনন্দ করতে খুব ভালোবাসতো। তাই ভাবলাম যে আনন্দের মাঝে কোথাও ঘুরে আসা যাক। রাত্রে সবাই মিলে ভাবতে বসলাম কোথায় যাওয়া যায়। অনুপ বলল বিষ্ণুপুর। তখন শুভ বলল না ওখানে পরে যাবো আমার এখন GD পরীক্ষা আছে। তখন আমি বললাম পরীক্ষা তো কী হয়েছে একদিন তো ঘুরে আসি চল। অনেক কষ্ট করে বোঝালাম, তারপর বলল হ্যাঁ। তারপর আর কী সবাই বিরাট খুশি, সবাই কাল বিষ্ণুপুর যাবো। তারপর খাবার খেতে গেলাম। খেতে গিয়ে খুশির আর শেষ নেই। তারপর কী হল। বলল বিষ্ণুপুর নয় বনলতা যাবো, তখন বিষ্ণুপুর ক্যানসেল। কী আর করা যায় তাই চলো বনলতা, আমার ঘুরতে যাওয়া নিয়ে কথা। বনলতা কোন দিকে জানতাম না। তখন 2nd year এর দাদাদের কাছ থেকে Information জোগাড় করতে হবে। গেলাম চিন্ময়দার কাছে। দাদার বাড়ি ছিল বনলতার দিকে সব কিছু বললো। ঠিকই আছে যা হবে দেখা যাবে, বেরিয়ে গেলাম। একজন ছিল 2nd year এর অয়ন দা ছেলেটি খুবই ভালো। কিন্তু বাকিটা আর বললাম না। তারপর সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠা মানে যুদ্ধ করতে যাওয়া। কী আর করা যায় ওঠতে তো হবে। তারপর শুভর Hindi Song এর Alarm শুনে ঘুম থেকে উঠলাম। তারপর ঘুম থেকে ওঠে একটিই কাজ-যাওয়া। ভাবছিলাম যাবো কী যাবো না। ভাবলাম ঘুরেই আসি। তারপর মুখ ধুলাম। বনলতার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। এরপর বাস ধরার পালা। বেরিয়েছি যেতে তো হবে। বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে বাস আর পাই না। দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই। বাস আর আসে নি। আমরা সবাই রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছি। অনেকক্ষণ পরে একটা বাসের দেখা মিলল শতদল। বাসে উঠলাম আমরা সবাই বিরাট খুশি বনলতা যাবো। আমাদের জন্য বাসের পিছনের শিটগুলি ফাঁকা ছিল। বসলাম কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম যে আজ কেন বাস আসেনি। আজ নাকি তৃণমূল পার্টির মিটিং ছিল, তাই সব বাস নিয়েছিল। তারপর বাস কনডাক্টার কাকুর সাথে গল্প করছিলাম। বলছিল যে বিষ্ণুপুর যাবার আগেই বাসটা পাছে নিয়ে না নেয়। তারপর দেখলাম না নেয় নি। আস্তে আস্তে বিষ্ণুপুর পৌঁছে গেলাম। বাস থেকে নামতে না নামতে দেখি জয়পুর বনলতা যাবার বাস আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেই বাসে উঠে পড়লাম। বাসটায় ছিল প্রচুর ভিড়। নিশ্বাস নেবার জায়গা নেই। উঠে গেছি আর উপায় নেই আস্তে আস্তে পৌঁছে গেলাম জয়পুর বাসস্ট্যাণ্ডে। খিদে ও পেয়েছিল বেদম তাই আগে খেয়ে

নিলাম। মুড়ি,চপ, লুচি আমি সবই টেস্ট করলাম। তারপর বনলতা যাবার পালা। জিজ্ঞেস করলাম একজন কাকুকে বনলতা কোন দিকে। সোজা পথ দেখিয়ে দিল ১০০ মিটার সোজা হাটলেই। তারপর ভিতরে প্রবেশ করতে যাবো তখনই দেখি একটি বিরাট মূর্তি। সেই মূতিটি তৈরি করেছিল আমাদের প্রিয় স্যার শ্যামাপ্রসাদ সাঁতরা মহাশয়, আমি তো অবাক। ছবি তুললাম কয়েকটা। তারপর ভিতরে গেলাম দেখলাম শুধু ফুলগাছ আর ফুলগাছ, অনেক রকমের ফুল দেখলাম। আরো দেখলাম একটি ছোটো পুকুরে অনেক রকমের বড়ো বড়ো মাছ। ছবি তুললাম আমাদের আর তো কোনো কাজ নেই। কিছুক্ষণ বসলাম দোলনায় একটু দোল খেলাম। আর ভালো লাগলো না বেরিয়ে পড়লাম বনলতা থেকে। বাইরে গিয়ে চা খেতে মন গেল খেলাম। চা খাওয়া হলো এবারে আর কী। হোস্টেলে ফিরে যেতে হবে। তাই বাসস্ট্যাণ্ড গেলাম। সেখানে সেই একি ব্যাপার বাস নেই। অনেকক্ষণ ফোন ঘাটলাম। ১ ঘন্টা পর একটি বাস এলো। আমাদের মুখে হাসি ফুটল। বাসে চেপেই গেলাম। বাসটা আস্তে আস্তে আসছিল। আমরা ভাবলাম হেঁটে গেলে আগে পৌঁছাতাম। কী আর করা যায় আর বাস নেই তাই কিছু করার নেই। বিষ্ণুপুর পৌঁছে গেলাম। বাস থেকে নেমে ভাবলাম বাস আছে। কিন্তু মিটিং থাকার কারনে বাস আর ছিল না। ছিল কিন্তু অনেক পরে সন্ধ্যা ৬টার সময়। তখন ভাবলাম কী করা যায়, ট্রেন মাথায় এলো। দেখলাম ট্রেনের টাইমে কোনো ট্রেন নেই। তারপর ভাবলাম আর কিছু করার নেই গাড়ি একটি করতেই হবে। কাকুকে জিজ্ঞেস করলাম বললো ১০০০ টাকা লাগবে। আমরা তো অবাক ১৬ কিলোমিটার রাস্তা ১০০০ টাকা গাড়ী ভাড়া। আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম ৮০০ টাকা বলল। অনেক চেষ্টা করলাম কমানো গেল না। আমাদের বাজেট টা এত ছিল না। তাই আমরা একটু অপেক্ষা করলাম। চা খেলাম। তারপর সবাই ঠিক করলাম হেঁটে সাবড়াকোন যাবো। আমাদের মধ্যে কতকজন বললো অসম্ভব, কোনো মতেই না। কিছুক্ষণ পর তারাও বুঝল কিছু করার নেই। তাই হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটছি তো হাঁটছিই পথ আর শেষ হয় না। মাঝখানে কিছু ছবি তুললাম । বিষ্ণুপুর থেকে সাবড়াকোন হেঁটে আসছি, কিছু ভিডিও করলাম আর কী আমাদের অনেকেই বার-পাঁচেক বসলো। তারপর দেখা মিলল মাগুির, তখন বাজে ৫.৩০ মিঃ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। খিদে পেয়েছে তাই কিছু খেলাম দোকানে। আর একটি রোমাঞ্চকর কাহিনি হয়েছিল একটা টোটোবালা কাকু আমাদের দেখে বলেছিল বা! পারবি তোরা। সে আর কী বিষ্ণুপুর থেকে সাবড়াকোণ আসার সময় দেখছিল আমরা হাঁটছি। আর ফেরার সময়ও দেখছে আমরা হাঁটছি। অনেক যুদ্ধ করে অবশেষে আমরা সাবড়াকোণে পৌঁছালাম। সবাই শুনে অবাক। এভাবেই শেষ হলো আমার গল্প।

●

একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

পিয়ূষ মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)

ভ্রমণ আমাদের বর্তমান জীবনের এমন একটি অংশ যাকে অস্বীকার করে কোনোভাবেই ভালো থাকা যায় না। ভ্রমণ আমাদের ক্লান্তি ও গ্লানিতে ভরে ওঠা মনকে পুনরায় কোনো এক জাদুকরির ছোঁয়ায় সতেজ করে তোলে। বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ের পড়াশোনা আর চার দেওয়ালের মধ্যে একঘেয়েমি জীবন কাটাতে কাটাতে আমরা অনেক সময় হাঁপিয়ে উঠি। আমাদের একঘেয়েমি জীবন কাটাতে ভালো লাগে না। তাছাড়া আমাদের একঘেয়েমি জীবনে আসে ক্লান্তিকর অবসাদ, মানসিক চিন্তা, কাজে মন বসে না, পড়াশোনায় ঠিকমতো উৎসাহিত হতে পারি না ইত্যাদি। তাই আমাদের মন চায় মাঝে মাঝে একটু নতুনত্বের আস্বাদ। এছাড়া ভ্রমণ করতে সবারই মন চায়। কিন্তু তা আমাদের এই ব্যস্ত জীবনে হয়ে উঠা সম্ভব হয় না। এইজন্য প্রত্যেক বছর কোথাও না কোথাও ব্যস্ত জীবন থেকে মুক্তি নেবার উদ্দেশ্যে আমরা ভ্রমণ করি। যা আমাদের মনকে কিছু সময়ের জন্যে আনন্দমুখরিত এবং ব্যস্ত জীবন থেকে বের করে এনে কিছু নতুন বস্তুর বা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এর সাথে দেখা করিয়ে দেয়।

ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রথমত যথাযথ স্থান নির্বাচন করা একটি সুন্দর ভ্রমণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাহাড়, সমুদ্র, নদী-নালা, পর্বত জঙ্গল ইত্যাদি সবই আমাদের সবারই অত্যন্ত পছন্দের বিষয়। যেগুলি আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে। এইবার আমরা পছন্দের মতো জায়গা খুঁজে নেওয়ার পর সুন্দরবনকে আমরা একটি সুন্দর ভ্রমণের স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিলাম। সুন্দরবন একই সাথে নদী, মোহনা, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত এবং বিভিন্ন ধরণের সুন্দরী গাছ এর সমন্বয়ে এক অপূর্ব সমাহার এবং সেখানে বিভিন্ন ধরণের সুন্দরী গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের গন্তব্য সুন্দরবনের যাত্রা শুরু হয় শিয়ালদা স্টেশন থেকে। এইখান থেকে লোকাল ট্রেনে চেপে ক্যানিং স্টেশন থেকে বাস ও অটোতে পোঁছে গেলাম সোনাখালি লঞ্চঘাট। সেখান থেকে লঞ্চে করে সুন্দরবনের বুকে একটু একটু করে আমাদের প্রবেশ শুরু। তারপর সেখানে শেষমেষ পোঁছে গেলাম। এবং সেখানে পোঁছে নানারকম প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সন্ধান পেলাম এবং বিভিন্ন রকমের সুন্দরী গাছের দেখা পেলাম এবং আমাদের যাত্রা পথ খুব সুন্দরভাবে কেটেছিল।

সুন্দরবন এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নানারকম সুন্দরী গাছের সমাবেশে বেষ্টিত এক বৈচিত্র্যময় অঞ্চল। আমাদের সুন্দরবন ভ্রমনের ক্ষেত্রে এক গাইড ছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি আমাদের বিভিন্নরকম গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদির সম্বন্ধে বলবেন এবং আমাদেরকে বিভিন্ন রকম জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন এবং বিভিন্ন রকমের সুন্দর বনের গাছ সম্বন্ধে আমরা জানতে পারলাম।

এবং আমরা সেই গাইডের কাছ থেকে জানতে পারলাম এখানে কতরকমের উদ্ভিদ আছে এবং কত রকমের পশুপাখি বসবাস করে। এবং তিনি বললেন যে এখানে ৩০০ প্রজাতির উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। এতদিন যে আমরা বইতে পড়া শ্বাসমূল ও ঠেসমূল দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং সেখানে বিভিন্ন রকম সুন্দরী গাছেদের শ্বাসমূল ও ঠেসমূল সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের তথ্য জেনেছিলাম। এবং বিভিন্ন রকমের শ্বাসমূল ও ঠেসমূল স্বচক্ষে দেখেছিলাম। চলতে চলতে আমাদের চোখে পড়ল ফুল ও লতাগুল্ম। সুন্দরবনে বিভিন্ন ধরণের লতাগুল্ম ও বিভিন্ন ধরনের ফুল এর গাছ ও দেখতে পাওয়া যায়।

সুন্দরবনের উদ্ভিদ ছাড়াও আরেকটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হল এখানকার যে বিভিন্নরকমের প্রাণীকূল। সুন্দরবনের স্থলভাগ বিভিন্ন ধরনের প্রাণীদের স্বর্গরাজ্য। এখানে উদ্ভিদ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীকূল বসবাস করে এবং এদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরবনে উল্লেখযোগ্য হল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। এখানে এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবী বিখ্যাত। প্রথম দিন যখন আমরা সুন্দরবনে প্রবেশ করি বা পৌঁছায় সেদিন সেখানে কোনোরকমের বাঘ দেখতে পাওয়া যায় নি। এবং সেদিন শুধুমাত্র সেখানে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ দেখতে পেয়েছিলাম। এবং সুন্দরবনে সুন্দরী গাছ ছাড়াও যা যা সেদিন দেখেছিলাম তা কোনো অংশে কম নয় এবং সেদিন সেখানে অনেক কিছুই দেখেছিলাম। বিভিন্ন ধরনের সুন্দরী গাছ এবং সুন্দরবনের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সেগুলি সেদিন দেখেছিলাম সুন্দরবনে। সেখানে বিখ্যাত চিত্রা হরিণের পাল জল খেতে এসেছিল নদীর ধারে, গাছ এর ডাল থেকে উড়ে বেড়ায় বিভিন্ন ধরনের ভিন্ন ভিন্ন রঙের সুন্দর সুন্দর পাখীরা। এছাড়াও সেখানে গোসাপ, কাঠ বিড়ালী সহ বিভিন্ন ধরনের প্রাণী প্রজাতি এবং সুন্দর সুন্দর পশুপাখি এবং বিভিন্ন ধরনের সুন্দরী সুন্দরী গাছ রয়েছে।

বাঙালি একদিনে যেমন ভ্রমণ করতে ভালোবাসে, তেমনি আর এক-দিকে খাদ্য রসিকও বটে। এবং বাঙালীরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য খেতেও পছন্দ করে। সুন্দরবন বেড়াতে যাওয়ার আগের দিন আমরা সবকিছু খাবার জিনিষ গুছিয়ে নিয়েছিলাম। সুন্দরবনে যাওয়ার পর সকালে বিভিন্ন ধরনের টিফিন, ব্রেকফাস্ট খেয়েছিলাম। তারপর আমরা সেখানে একটু বেলা করে মুড়ি, বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং সেখানে কিছু খাবার কিনে মুড়ির সাথে খেয়েছিলাম। তারপর সেখানে কাঁকড়া ধরে কাঁকড়ার ঝোল এবং মাটির হাঁড়িতে রন্ধন করা বনমোরগের মাংসের ঝোল খেয়েছিলাম। এবং সেখানাকার বনমোরগের ঝোলো স্বাদ দারুন। সেটা কখনো ভুলার নয়। এবং সুন্দরবনের খাঁটি মধু , বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদ ফল আমাদের তৃষ্ণা মিটিয়েছিল ও বিকেলে কেক, মিষ্টি ইত্যাদি টিফিন করেছিলাম। এই হল আমাদের সুন্দরবন ভ্রমনের জন্য খাদ্যের তালিকা।

এইভাবে আমরা কয়েকদিন সুন্দরবন অর্থাৎ প্রকৃতির কোলে কাটিয়ে নিজেদের জীবনে ফিরে এসেছিলাম। যখন আমরা ফিরে আসি তখন জলপথকে বেছে নিয়েছিলাম। যার অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। জলপথে ফেরায় আমাদের অভিজ্ঞতাও খুব আনন্দময় ছিল। প্রকৃতির এই পরম আশ্রয়ে ওই কয়েকটা দিন আমার পরবর্তী সারাবছরের জন্য বাঁচার রসদ জুগিয়ে ছিল এবং আমি সুন্দরবন ভ্রমণ করে বেশ মজা পেয়েছিলাম। এবং যখন চারিদিকে ঘুরি এবং সবকিছু দেখি নতুন নতুন গাছপালা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ তখন মনের মধ্যে একটা অন্যরকম অনুভূতি জন্মেছিল। এবং আমাকে প্রতিবছর এই জন্মদিনের আনন্দের জন্য প্রকৃতির কোলে বারে বারে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে এবং প্রতি বছর কোথাও না কোথাও ভ্রমনে যেতে ইচ্ছে হয়।

●

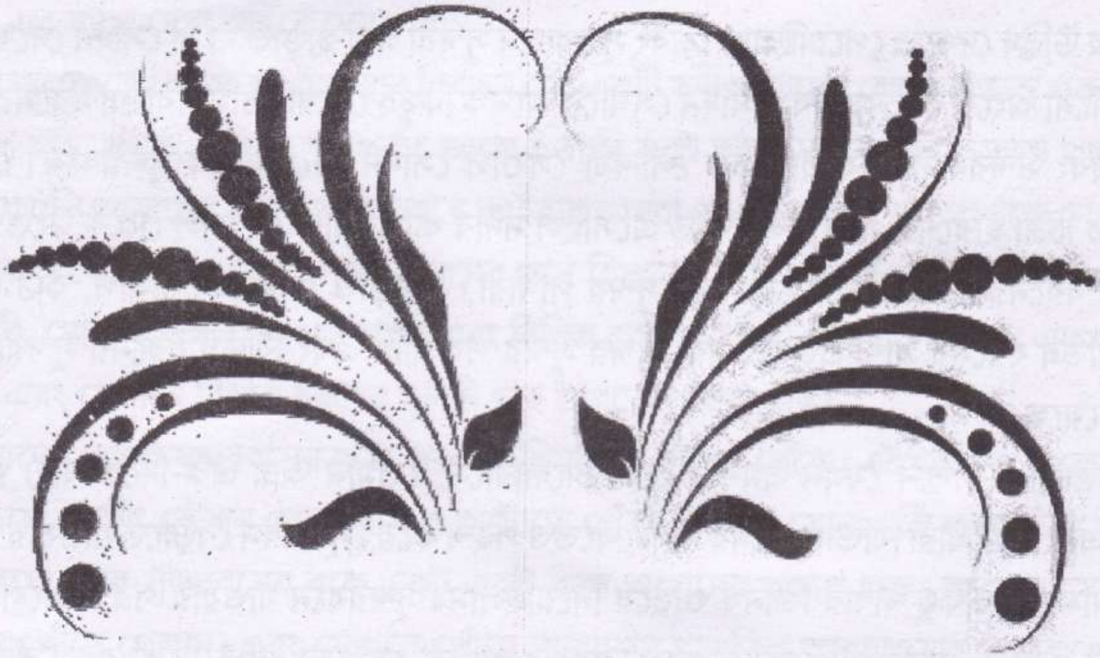

"পদ্মের মত শিশুদের মন, সূর্যের আলোয় তা অল্প অল্প পাপড়ি মেলে সৌরভ ছড়ায়। যদি আলো বাতাস না থাকে তাহলে শিশুমন ম্লান হয়ে শুকিয়ে যায়। শিশুমনে আলো বাতাস বইয়ে দেওয়াই শিক্ষকের কাজ।"

— রবীন্দ্রনাথ

শিলং ও চেরাপুঞ্জি যেমন

ইন্দ্রজিৎ হাঁসদা (প্রথম বর্ষ)

ভ্রমণ করতে কার না ভালো লাগে। অনেক দূর ভ্রমণে যেতে আমাদের অনেকের মনের প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু নানা অসুবিধার কারনে আমরা অনেক সময় দূরের ভ্রমণ যেতে পারি না। দূরের ভ্রমণে না যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে হল টাকা পয়সার অভাব।

আমরা সকলেই পিসির বাড়ি, মাসির বাড়ি, মামার বাড়ি অথবা যে কোনো আত্মীয় জনের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছি। কিন্তু দূরের কোনো ভ্রমণের আমাদের সকলের কাছে অনেক দিনের আশা আকাঙ্খা। তাই আমরা সকলেই চাই দূরের কোনো ভ্রমণে যেতে এবং সেখানে গিয়ে আমরা আনন্দ ও সেই জায়গাটিকে উপভোগ করতে চাই।

অচেনাকে চেনা অজানাকে জানার জন্যই তো মানুষ বেরিয়ে পড়ে আর সেই সূত্রের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে মধুর।

বর্তমান কাল হল বিজ্ঞানের যুগ আর এ যুগে মানুষ দৈনন্দিন জীবনে বৈচিত্রহীন একঘেয়ামিতে কাটায়। তার এই একঘেয়ামিতে থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মানুষের মনে ভ্রমণের তাগিদ প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়।

গত গ্রীষ্মকালে শিলং ভ্রমণ এর অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। তখন সালটি ছিল ২০১৬ আমি তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়তাম। গ্রীষ্মকালের শুরুতেই যখন বাবা আমাদের সকলকে জানালেন যে বার্সেলোনা রাতে যাব তখন আমরা সবাই আবেগ ও উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠি। আর আবেগ ও উত্তেজনার সাথে আমরা অপেক্ষা করেছিলাম সেই দিন কবে আসবে সেই অব্দি সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিয়ে মে মাসের এক সকালে কোলকাতা থেকে গোয়াহাটি ট্রেনে চেপে বসলাম।

গুয়াহাটিতে নেমে চেপে বসলাম বাসে। সেখান থেকে ১০৪ কিমি দূরে শিলং যাবার উদ্দেশ্যে। আর পাঁচটা পাহাড়ি শহর অর্থাৎ কুলু, মানালি, সিমলা, দার্জিলিংয়ের থেকে আলাদা ছিল। শিলং পৌছে যা দেখলাম তা আশা করি জীবনে ভোলা যাবে না।

শহরের একদিকে রয়েছে সুইট ফলস আর অন্যদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমেছে জোড়া ঝরণা যেন যমজ ভাই। ঝরণা দেখে আমরা সকলে খুব আনন্দিত হয়েছিলাম এবং ঝরণা ঠেকিয়ে দারুনভাবে উপভোগ করেছিলাম।

আমরা গিয়েছিলাম শিলং পিট রেলিং বাঁধানো প্রায় সমতল পাহাড়ের চূড়া বা শিলং এর সবচেয়ে বেশি উচুঁ ভিউ পয়েন্ট। সেখান থেকে দেখা যায় শিলং শহর খেলার মতো ছোটো ছোটো বাড়ি

আর বাগান চোখে পড়ে সবুজ ঘাসে ভরা অন্তহীন এক সমুদ্র। তারপরে আমরা সবাই মিলে গেলাম শিলং এর কাছে চেরাপুঞ্জিতে যেখানে সবসময় বৃষ্টি ঝরে আত্মার সঙ্গে রয়েছে অজস্র সুন্দর ঝর্ণাধারা। এরপর আমরা গেলাম লিভিংরতে এটা একটা কুমারী বন কারণ এ পর্যন্ত কোনো কাঠুরে বা চোরাশিকারীর হাত ছুঁতে পারেনি এই বনকে। এই বনের উদ্ভূত কাহিনী শুনে আমরা সবাই অবাক হয়েছিলাম।

সবশেষে বলতে গেলে শিলংয়ের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে আমাদের সকলের মন ভরে গিয়েছিল ও তার সাথে আমাদের সকলের চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল।

শিলং এর সৌন্দর্য উপভোগ করার পর আমরা সকলে নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে এসে বাড়ির পথে রওনা জন্য গাড়ি ধরতে হলো কিন্তু ওই হৃদয় জুড়ে হয়ে গেল শিলং ভ্রমণের স্মৃতি।

এখনো আমার মনে পড়ে সেই ঝর্ণার সৌন্দর্য, অপূর্ব মাধুর্য সেখানাকার লোক সংস্কৃতি। এই শিলং ভ্রমণ এর অভিজ্ঞতা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

●

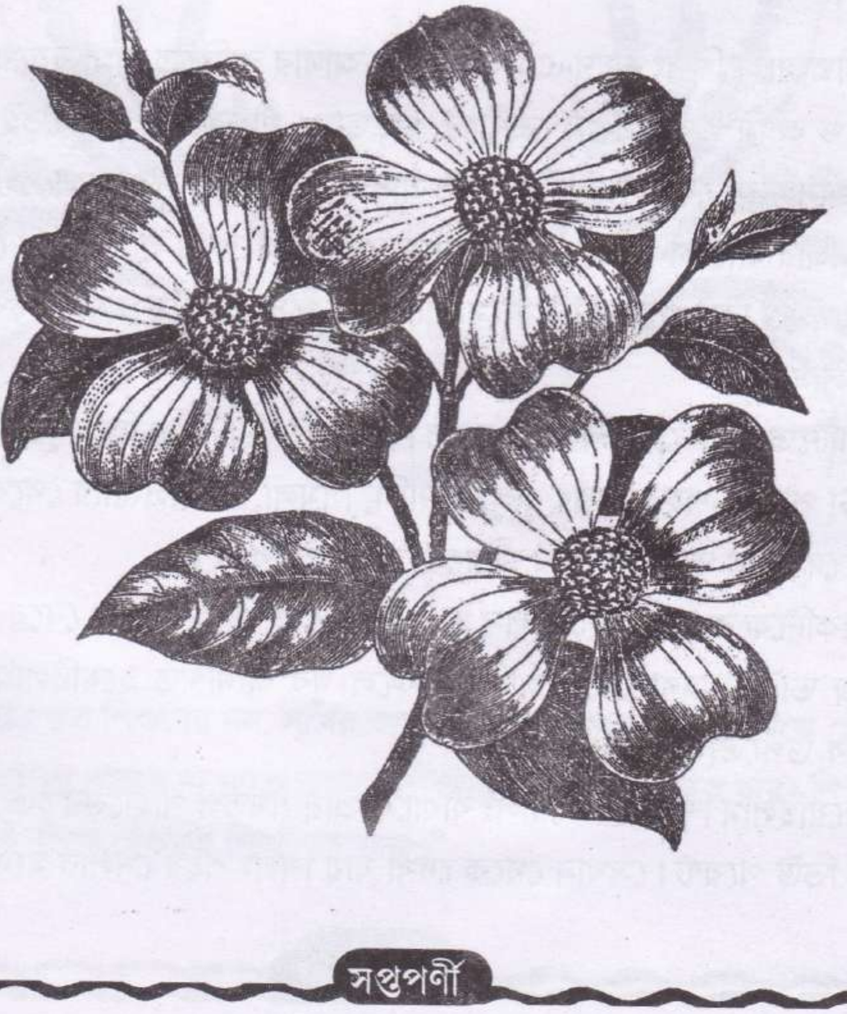

এক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

সৌম্যদীপ মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)

সালটা ২০২৩। বছর সেই সবে শুরু। আমি তখন সাবড়াকোনে বেসিক কলেজে পাঠ্যরত প্রথম বর্ষের এক ছাত্র। আমি হোস্টেলেই থাকতাম। শুধু আমি না আমি বাদ দিয়েও প্রথম বর্ষের ৩৮ জন থাকতো এবং দ্বিতীয় বর্ষের সম্ভবত ৩৭ জন থাকতো। তো হোস্টেল মানেই তো বন্ধুদের সাথে হাসি-ফূর্তি একটু বেশি হয়। এবার ওই এত জনের মধ্যে আমি ছিলাম শ্রীসদন ভবনের অন্তর্গত। আর আমাদের পাশের ভবনটির নাম ছিল সারদা ভবন। এভাবেই মোট ৬টি ভবন ছিল। তো হোস্টেলে প্রতিদিন একঘেয়েমি ভাবে থাকতে থাকতে সারদা ভবনের ছেলেরা একদিন হঠাৎ করে ঠিক করলো বছরের শুরুতে কোথাও ঘুরতে যাবে। সেই ভেবে তারা আরও ছেলে জোগাড় করছিল যাতে আনন্দ ফূর্তিটা আরও বেশী হয়। এবার যখন আনন্দ ফূর্তির কথা উঠেছে সেখানে কি আর শ্রীসদন ভবনের ছেলেরা না থাকলে হয়। তো সেই মত শ্রীসদন এবং সারদা ভবনের ৩০ জন মিলে ঘুরতে যাওয়া ঠিক হল। কিন্তু এবার প্রশ্ন হচ্ছে ঘুরতে যাব কোথায়? তখন ভবনের দেয়ালে লেখা সারদা ভবন দেখে সারদা মায়ের কথা মনে পড়ে। তারপর প্রত্যেক সদস্যের সম্মতি নিয়ে স্থির করা হল সারদা মায়ের বাড়ি দেখতে যাওয়ার। অবশ্য জায়গাটা আমাদের কলেজের থেকে খুব একটা দূর না। দেখলাম আমাদের বাজেটের মধ্যেও চলে যাবে। কিন্তু নতুন জায়গা, সব সামলে উঠতে পারব কি না সেই ভেবে চিন্তাই পরলাম, দল নেতা তো প্রয়োজন। তখন দ্বিতীয় বর্ষে পাঠরত এক দাদা বলে উঠল আমি তোদের নেতৃত্ব দেব। সেই মত এবার দিন ঠিক করার পালা। এবার হোস্টেলের দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের পাতা উল্টে দেখা গেল সামনে ১২ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। কলেজেও ছুটি। ঠিক করা হল ওই দিনেই সারদা মায়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেব। কিন্তু এবার সমস্যা হচ্ছে হোস্টেল থেকে ঘুরতে যাচ্ছি তো স্যারদের বলে যাওয়া উচিত। কিন্তু তাঁরা শুনে যেতে দেবেন কী দেবেন না সেই সংশয়ে আমরা ঠিক করলাম না বলেই যাবো। সেই মত আমরা সকাল ৬টাতে অ্যালার্ম সেট করে ঘুমিয়ে পড়ি। পরের দিন অর্থাৎ ১২ই জানুয়ারী শীতের সকাল ৬টা নাগাদ আমরা সারদা মায়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। তারপর বাসে চেপে ৪৯ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আমরা সারদা মায়ের বাড়ীতে অর্থাৎ জয়রামবাটি পৌছালাম। সেখানে আমরা মায়ের থাকার ঘর থেকে শুরু করে উনুনশালা, বৈঠক ঘর সবই প্রায় দেখে ফেললাম। সেখানকার পরিবেশ খুবই শান্ত এবং সুন্দর। খুব নিয়মশৃঙ্খলা মেনেই সেখানে ভ্রমনার্থিরা পরিদর্শন করেছেন মায়ের বাড়ি। মায়ের বাড়িটা পুরোপুরি দেখার পর আমরা রওনা দিই মায়ের শ্বশুর বাড়ি অর্থাৎ কামারপুকুরের দিকে,

মায়ের বাড়ি থেকে কামারপুকুরের দূরত্ব প্রায় ৭ কিমি দূরে। তাই আমরা টেটো করে সেখানে যাই। শুনেছি আগে রামকৃষ্ণদেব হেঁটে হেঁটেই মায়ের বাড়ি যেতেন। তারপর আমরা রামকৃষ্ণদেবের বাড়িতে পৌঁছালাম। সেখানেও একই নিয়মশৃঙ্খলা এবং খুব শান্ত পরিবেশ। সেখানে আমরা রামকৃষ্ণদেবকে ছাড়াও মহাদেবের সাক্ষাৎ পাই। সেখানে ছবি তোলা নিষেধ ছিল কিন্তু আমরা বন্ধুরা লুকিয়ে ফেসবুকে আপলোড করার মতো ছবি তুলে নিয়েছিল। রামকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে তাকে ছাড়াও আমরা তার নিজের হাতে লাগানো বিশাল এক আমগাছের দর্শন পাই। তারপর সেখানে আর কিছুক্ষণ থাকার পর আমরা আবার সারদা মায়ের বাড়িতে প্রসাদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে রওনা দিই, সেখানে আমরা মায়ের চরণে ৬০১ টাকা দান করি। এবং প্রসাদ গ্রহণ সমাপ্ত হলে আমরা শেষমেশ কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। সেখান থেকে খুব হইচই করে হোস্টেলে ফিরে এলাম। বন্ধুদের সাথে খুবই মজা হল। এটা ভ্রমণের সাথে এক তীর্থ যাত্রাও হল। শেষমেশ ওই দিনটা আমার কাছে একটি বিশেষ দিন ছিল। দিনটা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

●

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

অধ্যাপক পল্লব ঘোষ

ভ্রমণ মানে অচেনাকে চেনা, অজানাকে জানা, আর সেই ভ্রমণ যদি হয় শিক্ষামূলক তাহলে তো কথাই নেই। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছরই শিক্ষামূলক ভ্রমণ হয়ে থাকে কোভিড-১৯ এর সময় দুবছর আমাদের কোনো শিক্ষামূলক ভ্রমণ হয়নি। এই বছরই ভ্রমণ নিয়ে আমাদের উত্তেজনা ছিল প্রবল। সবার উত্তেজনায় আমরা সবাই মিলে স্থির করলাম আমাদের ভ্রমণ হবে মহারাষ্ট্র রাজ্যের অজন্তা ইলোরাকে ইতিহাসের পাতায় যা পড়েছি সেই অজন্তা-ইলোরা কে দেখার জন্য আমরা সবাই উদগ্রীব হয়ে রইলাম। শিক্ষক ছাত্র সবার মধ্যে এক উন্মাদনা তৈরী হয়েছে। যাওয়ার দিন স্থির হল ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২২। আমাদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মনোজ কুমার পাণ্ডে মহাশয় অজন্তা-ইলোরা সম্পর্কে জানার জন্য আগে থেকেই আমাদেরকে একটি বই দিয়ে রেখেছিলেন।

প্রস্তুতি পর্ব

দিন স্থির করার পর আমাদের শিক্ষকগণের মধ্যে ভ্রমণ নিয়ে আলোচনা শুরু হল। পূর্বের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে এবারের ভ্রমণ আমরা নিজেরাই আয়োজন করবো। ঠিক তো করে ফেললাম কিন্তু কিভাবে যাবো, কোথায় নামবো, খাবার কি হবে, ফিরবো কিভাবে এই সব চিন্তা মাথায় ঘুরতে লাগলো। শিক্ষক-ছাত্র মিলে সবাই ৫০ জন। কোনো ট্রাভেল এজেন্সি ছাড়া এতো জনকে নিয়ে ভ্রমণ করা নিতান্তই কঠিন। এই কঠিন কাজকে সহজ করতে এগিয়ে এলেন আমাদের পরিচিত শিক্ষক শ্রীরামপ্রসাদ কর্মকার মহাশয় এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক শ্রী মনোজবাবু এবং শ্যামাপ্রসাদবাবু। রামপ্রসাদবাবু বলে দিলেন ভ্রমণের মাধ্যম এবং এখানের ম্যাপ। এই ভ্রমণের আয়োজনের কিছুটা দায়িত্ব এসে পড়ল আমার উপর। আয়োজনের ব্যবস্থায় সাহায্য করলেন এবং সাহস দিলেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মনোজবাবু এবং অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ সাঁতরাবাবু। দিন স্থির হয়ে যাওয়ার পর আমরা সবাই ট্রেনে যাওয়ার ও ফেরার টিকিট কেটে ফেললাম। দিনটির প্রতীক্ষায় আমরা ক্যালেণ্ডারে নজর দিলাম। এরপর হোটেল ও বাস বুকিং করার পালা। গুগল এর সাহয্যে সেগুলোর ও বুকিং করা হল। বুকিং করার ২ মাস পর আমাদের যাত্রা শুরু।

ভ্রমণ শুরু

যথারীতি ভ্রমনের দিন উপস্থিত হল আমাদের মধ্যে আনন্দ চরম সীমায় পৌঁছেছে। যাওয়ার আনন্দ, নতুনকে দেখার আনন্দ একসাথে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার আনন্দ ইতিহাসকে জানার

আগ্রহ। এত আনন্দ আবেগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ঔরঙ্গাবাদের উদ্দেশ্যে। ট্রেন ছাড়ার অনেক পূর্বেই আমরা খড়গপুর স্টেশনে পৌঁছেছি। ট্রেন অনেকটাই লেট ছিল। তাই হোস্টেলের নিয়ে যাওয়া খাবারেই ডিনার সারা হল। সবার মধ্যে ঘুম ঘুম ভাব। রাত্রি ১টার সময় ট্রেন ছাড়ল খড়গপুর থেকে এবং আমরা সবাই ট্রেনে উঠে ঘুম দিলাম। ট্রেন চলছে তার আপন মনে। দিবারাত্রি ট্রেনে কাটিয়ে আমরা পৌঁছালাম জলগাঁও স্টেশনে। স্টেশন থেকে খানিক দূরে আমাদের হোটেল। রান্না কর্মী শ্রী রঘুনাথ দুলে ও শ্রী স্বপন কর এর সহযোগিতায় সকলে খাবার খেয়ে এবং ফ্রেস হয়ে রওনা দিলাম বাসে অজন্তার উদ্দেশ্যে। কয়েকঘন্টা পর আমরা অজন্তায় পৌঁছে যাবতীয় টিকিট কেটে নিলাম। আমাদের মন জানতে চায় কেমন হবে অজন্তা, কী থাকবে, এখানে দেখতে পাবো কি গুহা না শুধু ভগ্নস্তুপ। কিছুক্ষণ পর আমরা বহু প্রতিক্ষিত অজন্তা গুহায় প্রবেশ করলাম।

অজন্তা ঃ

খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ থেকে খ্রিস্টের ৬৫০ অর্থাৎ ৮০০ বছর ধরে সহ্যাদ্রি পর্বতে গড়ে উঠেছে এই বিস্ময়কর বৌদ্ধ গুহা মন্দির, প্রাচীন ইতিহাস পড়ে জানতে পেরেছিলাম যে প্রচুর বৌদ্ধ ভিক্ষুক শিল্পী ও শ্রমিকদের শ্রমে গড়ে উঠেছে এই অর্ধচন্দ্রাকৃতি অশ্বক্ষুরের মতন দেখতে অজন্তা গুহা মন্দির। মোট ২৯টি গুহা নিয়ে তৈরি অজন্তায় রয়েছে মহাযান ও হীনযান এই দুই মতালম্বীদের সৃষ্টি শিল্পী।

অজন্তার প্রত্যেকটি গুহার দেওয়ালে রয়েছে প্রচুর চিত্র পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে কেটে তৈরী করা হযেছে এই অবিস্মরণীয় গুহাগুলি আর এর দেওয়াল গুলিতে খোদাই করে ভাস্কর্য তৈরী করা হয়েছে। গুহার দেওয়ালে রয়েছে প্রাকৃতিক রং দিয়ে করা পেন্টিং যার মাহাত্ম স্বচক্ষে না দেখলে অনুভব করা যায় না। বেশীর ভাগ পেন্টিং এ রয়েছে বিভিন্ন গল্প। অজন্তার দেওয়ালের চিত্রগুলি বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কাহিনী বর্ণনা করেছে। ফ্রেস্কো ধাঁচের এই দেওয়াল চিত্রগুলি যেন জীবন্ত মনে হয় এবং তারই সাথে এগুলোতে রয়েছে নানা রঙের সমাহার। ১৯৮৩ সাল থেকে এই স্থানটি একটি ইউনেকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট।

যদিও অজন্তার গুহাচিত্র এখন অনেকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে তবে বোঝায় যায় যে এই গুহাগুলি মূলত বৌদ্ধ মন্দির। বেশ কয়েকটি গুহায় রয়েছে বিভিন্ন ভঙ্গীমায় অবস্থিত ভগবান বুদ্ধের মূর্ত্তি।

অজন্তাগুহার সবকিছু চিত্র এবং মূর্তি সম্পর্কে জানতে পারি ওখানকার ট্যুর গাইড এবং মনোজবাবুর কাছ থেকে।

অজন্তা দর্শন করে আমরা ক্লান্ত শরীরে বাসে করে ঔরঙ্গাবাদ এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম পরের দিন ইলোরা, ইলোরা দর্শনের উদ্দেশ্যে রাত্রিতে ডিনার সেরে আমরা সবাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হলাম।

ইলোরা গুহা

পরের দিন সকালে উঠে তাড়াতাড়ি লাঞ্চ করে আমরা ইলোরা উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ইলোরা গুহা ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের ঔরঙ্গবাদ শহর থেকে ৩০ কিমি দূরে অবস্থিত। দুপুর ১টার মধ্যে আমরা ইলোরাগুহাতে প্রবেশ করলাম। ইলোরা সত্যি অপূর্ব রাষ্ট্রকুট রাজবংশ এই নিদর্শনের স্তুপগুলো নির্মাণ করেছিল। এখানে মোট ৩৪টি গুহা রয়েছে যেগুলো চরনন্দ্রী পাহাড়ের অভ্যন্তর থেকে খনন করে উদ্ধার করা হয়েছে।

এখানে বৌদ্ধ ধর্মের ১২টি হিন্দুধর্মের ১৭টি এবং জৈন ধর্মের ৫টি মন্দির রয়েছে। এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত বৌদ্ধগুহা হল ১০নং গুহা যা বিশ্বকর্মা গুহা নামে পরিচিত। এই গুহার ঠিক মধ্যখানে একটি ১৫ফুট লম্বা সিংহাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধ মূর্তি রয়েছে।

অজন্তা ও ইলোরার গুহাগুলির মধ্যে সবচেয়ে নজরকাড়া জিনিস হল যে এসব সুক্ষ্ম কারুকার্যগুলি হাত দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। শুধুমাত্র একটি হাতুড়ি ও ছাঁচে। আমরা অজন্তা গুহায় দেখেছি ভারতের বেশিরভাগ আধুনিক প্রাচীন চিত্রকর্ম। তবে ইলোরার গুহাগুলিতে অসাধারণ স্থাপত্যের নিদর্শন দেখে আমরা বিমুগ্ধ হয়েছিলাম।

ইলোরা দর্শন করে আবার আমরা ঔরঙ্গবাদে ফিরলাম। আমাদের ছাত্র ও রান্নাকর্মীদের সহযোগিতায় মাংস ভাত খেয়ে আমরা রুমের দিকে পা বাড়ালাম।

ঔরঙ্গাবাদ দর্শন

ইলোরার পরের দিন আমাদের গন্তব্য ঔরঙ্গবাদ শহর দর্শন। ঔরঙ্গবাদ শহরের মধ্যে কিছু দার্শনিক স্থান রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম বিবিকা মকবরা, ঔরঙ্গাবাদ গুহা, পাঁনচাক্কি, সুনহেরি মহল। বিবিকা মকবরা হল ঔরঙ্গাবাদে অবস্থিত একটি সমাধি এটিকে প্রায়ই তাজমহলের সাথে তুলনা করা হয়। এটি ১৬৬০ সালে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পুত্র যুবরাজ আজিম শাহ তার স্নেহময়ী মা দিলরাস বানু বেগম এর স্মরণে চালু করে ছিলেন। আমরা সবকিছু দর্শন করে এবং সবার সাথে গ্রুপ ছবি তুলে আমরা হোটেলে ফিরলাম টিফিন সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম শপিং এর উদ্দেশ্যে। ঔরঙ্গবাদের বিখ্যাত মল, মলে আমরা সবাই ভিড় জমালাম। পছন্দ মতো কেনাকাটা করে হোটেলে ফিরলাম।

সিরিডি দর্শন

পরের দিন আমাদের গন্তব্য সাঁই সিরিডি মন্দির। এটি মহারাষ্ট্রে একটি বিখ্যাত মন্দির। আমরা বহুকাল ধরে সাঁই সিরিডি এর বিভিন্ন গান শুনেছি। সারা দিন ধরে মন্দির দর্শন করা হয়। এই বিখ্যাত মন্দির দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। আমরা ঔরাঙ্গাবাদ থেকে ট্রেন ধরে কোপারগাঁও

জংশনে নেমে বাসে করে সিরিডি মন্দিরে পৌঁছালাম। বাসের মধ্যে আমাদের লাগেজ রেখে দিয়ে আমরা মন্দির দর্শনের উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়লাম। মন্দির দর্শদের জন্য অসংখ্য দর্শনার্থী ভিড় জমিয়েছেন। আমরাও সেই ভিড়ে সামিল হলাম। মন্দির দর্শনের পর কুপন সংগ্রহ করে অমৃতভোগ গ্রহণ করলাম। মন্দিরে চলার পথে আমাদেরকে হাসিতে মাতিয়ে রেখেছেন আমাদের শিক্ষক সাঁতরাবাবু। মন্দিরের প্রসাদ ছিল সত্যিই অসাধারণ। মন্দিরের লাড্ডু ও প্রসাদ আমরা সবাই ঘরের জন্য নিলাম। মন্দিরের সন্নিকটে প্রচুর প্রাসাদ, কাপড়, খেলনা ও বিভিন্ন দোকান রয়েছে। আমরা প্রয়োজন মত বাজার করলাম।

বাড়ী ফেরার পালা

মন্দির দর্শন সেরে রাত্রিতে হোটেলে খাবার খেয়ে এর দিকে বাস এগিয়ে গেলো। এত কিছু দর্শনের পর শরীর ক্লান্ত, মন ভারাক্রান্ত , মন চায় আর কিছু দেখতে, কিন্তু ট্রেন যে থামার নয়। ভারাক্রান্ত মনে আমরা সবাই ট্রেনে চেপে ফিরলাম আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠানে এই বছরের মতো আমরা আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ শেষ করলাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

আমি লেখক নই। এই লেখা যখন লিখছি তখন আমি আর সাবড়াকোন সরকারী শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নই। (ট্রান্সফারের কারণে শ্যামপাহাড়ি সরকারী শিক্ষক শিক্ষন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক)

প্রতিষ্ঠানের জন্য লিখতে খুব আগ্রহী ছিলাম তাই লিখেছি।

•

বর্ষ প্রসঙ্গে

অধ্যাপক শ্রী মনোজ কুমার পাণ্ডে

যদি কেউ জিজ্ঞেস করে পৃথিবীর আবর্তন কাল কত? আমরা কি উত্তর দেব বলুন তো। ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ড- আমাদের স্কুলের বই গুলিতে তাই লেখা আছে কিন্তু সত্যি কথাটা কি জানেন — উত্তরটা হল ডাহা ভুল। আঁতকে উঠলেন তাই না! জানেন কি এরকম অনেক ভুল প্রচলিত পাঠ্য পুস্তক গুলিতে লেখা থাকে এবং আমাদের শিক্ষক মশায়েরা পরোয়া না করে সেসব আমাদের গিলিয়ে দেন।

যাই হোক পৃথিবীর আবর্তন কাল কত? সেটা হল ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা ৯ মিনিট ৯.৫ সেকেণ্ড। প্রশ্নটা হল আমাদের পাঠ্য পুস্তকের তথ্যটা কি উড়ে এল — না তা নয়, আসলে ওটা হল পৃথিবীর ঋতুচক্রের কাল বা Tropical Year আর অন্যটা অর্থাৎ প্রকৃত আর্বতন কালকে বলা হয় Sideral Year.

একটু গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে তাই না। আসলে পৃথিবী তার কক্ষপথে ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা ৯ মিনিট ৯.৫ সেকেণ্ড সম্পূর্ণভাবে একবার পাক খাবার ২০ মিনিট ২৩.৫ সেকেণ্ড আগেই ঋতুচক্রটা শেষ করে ফেলে। কেন এমন হয়? উত্তরটা জানতে গেলে জানতে হবে। কেন ঋতু পরিবর্তন হয় — কারণটা হল পৃথিবীর বার্ষিক গতি এবং তার অক্ষের কক্ষ তলের সঙ্গে ৬৬ $\frac{১}{২}$ নতি। এটি তো আমাদের জানা — এর সঙ্গে জানতে হবে আরেকটা কারণ সেটা হল পৃথিবীর অয়ন গতি (Precession)

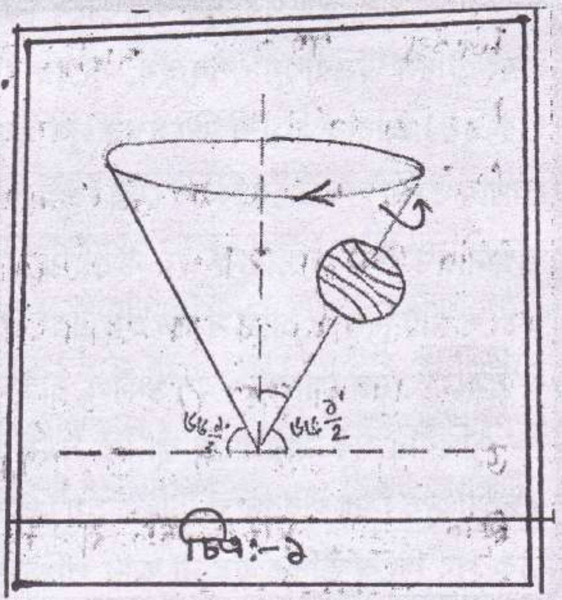

চিত্র:-১

আমরা জানি পৃথিবীর অক্ষ (ax is) তার কক্ষ তলের সঙ্গে ৬৬ $\frac{১}{২}$ কোন করে ঘুরে। এখন এই কোনটা কোন দিকে হবে। এটা নিয়ে একটা সমস্যা হয় — এই কোনটা কোন দিকে হবে ডাইনে না বাঁয়ে? উত্তরটা হল অয়ন গতির জন্য এই কোনটা ধীরে ধীরে সব দিকে হবে। আসলে ব্যাপারটা হল পৃথিবীর অক্ষটি ধীরে ধীরে শঙ্কুর আকারে পাক খেতে থাকে। ব্যাপারটা কেমন জানেন ঘুরন্ত লাটিমের গতি যখন কমে আসে তার অক্ষটা তখন হেলে গিয়ে যেমন হয় ওখানে অবস্থাটা ঠিক সেরকম। পৃথিবীর এরকম একবার পাক খেতে সময় লাগে ২৬০০০ বছর (প্রায়)।

এরপর ঋতু পরিবর্তনের কারনটা আলোচনা করা যাক।

পাশের ছবিটি দেখুন - ২২শে জুন পৃথিবীর উত্তর মেরু ?, দক্ষিন মেরুর তুলনায় সূর্যের দিকে বেশী হেলে থাকে। ঐ সময় পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিন গোলার্ধ সূর্য থেকে দূরে থাকায় দক্ষিণ গোলার্ধে ঐ সময় শীতকাল। আবার ২২শে ডিসেম্বর ব্যাপারটা ঠিক উল্টোভাবে ঘটছে। আবার দেখুন একই সঙ্গে পৃথিবী তার নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘুরছে ফলে দিন রাত হচ্ছে।

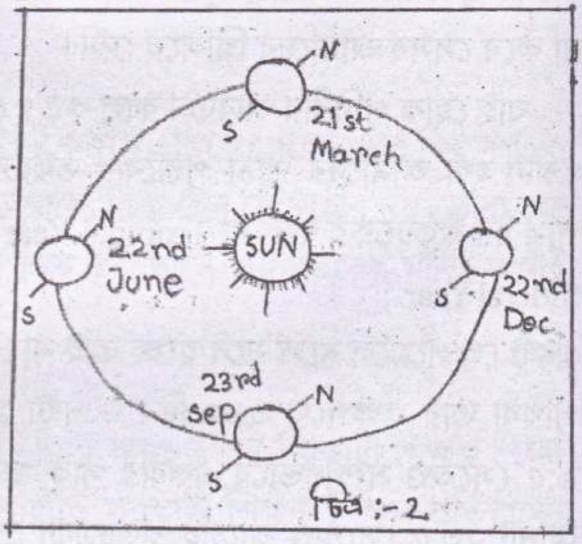

চিত্র :-2

২২শে জুন (৭ই আষাঢ়) উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড়। রাত্রি সবচেয়ে ছোট আবার ২২শে ডিসেম্বর (৭ই পৌষ) দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় এবং রাত্রি সবচেয়ে ছোট হয়। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেওয়া যাক — ২২শে জুন কর্কট সংক্রান্তি রেখার উপর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং ঐদিন উত্তরায়ন শেষ হয়, সূর্যের দক্ষিনায়ণ শুরু হয়। আবার ২২শে ডিসেম্বর সূর্য মকরক্রান্তি রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এই দিন সূর্যের দক্ষিনায়ণ শেষ হয়, শুরু হয় উত্তরায়নের। এরপর দিন বাড়তে থাকে একটু একটু করে এবং ২১শে মার্চ দিন ও রাত্রি সমান হয় এবং ঐদিন পৃথিবীর উভয় মেরু সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে। এ সময়ে উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল, দক্ষিন গোলার্ধে শরৎকাল। এ সময়ে আর একটা ঘটনা ঘটে — পৃথিবীর সব জায়গাতে স্থানীয় সময় সকাল ৬টাতে সূর্য উঠে আর সন্ধ্যা ৬টাতে অস্ত যায়। এছাড়া সূর্য ঠিক পূর্ব দিকে উদিত হয়। অস্ত যায় পশ্চিম দিকে। বছরের অন্যান্য দিনগুলিতে সূর্য ঠিক পূর্ব দিকে উদিত হয় না আর পশ্চিম দিকে অস্ত যায় না। ২৩শে সেপ্টেম্বর বা ৭ই আশ্বিন আগের মতই ঘটনা ঘটে অর্থাৎ দিন ও রাত্রি সমান হয়। এ সময় উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল, আবার দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল। ২১শে মার্চ কে বলে মহাবিষুব বা Vernal Equinox এবং ২৩শে সেপ্টেম্বরকে বলে জলবিষুব বা Autumnal Equinox। এ সম্বন্ধে একটা কথা বলা যেতে পারে বার্ষিক গতির ফলে মূলত যে ঘটনা ঘটে তা হল ঋতু পরিবর্তন সঙ্গে তাপ মাত্রার পরিবর্তন — এটা ঘটে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের কমা বাড়া, দিন ও রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ও বৃষ্টিপাতের জন্য। এখন ২নং ছবিটা একটু ভাল করে লক্ষ্য করুন — দেখুন পৃথিবীর সবকটা অবস্থানে অক্ষরেখা NS পরস্পর এর সঙ্গে সমান্তরাল। এই NS রেখাকে উত্তর দিকে ক্রমশ বাড়িয়ে দিলে তা মিলিত

হবে ধ্রুবতারায়। ঠিক এই কারণে উত্তর মেরুতে ধ্রুবতারা ঠিক মাথার উপরে থাকে। বলুনতো ধ্রুবতারা সবসময় ঠিক উত্তর দিকে থাকে কেন? ঠিক ধরেছেন NS রেখার N প্রান্ত সবসময় ধ্রুবতারার দিকে মুখ করে থাকে। ঐ একই কারনে আমাদের মনে হয় সব নক্ষত্র ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে পাক খাচ্ছে। আর একটা কথা জেনে নিন, অয়ন গতির জন্য ধ্রুবতারা স্থির নয়। আজ যে নক্ষত্র ধ্রুবতারা, কয়েক হাজার বছর পর অন্য কোন নক্ষত্র ধ্রুবতারা হবে। ব্যাখ্যাটা হল এরকম - আমরা জানি পৃথিবীর অক্ষরেখাকে উত্তরদিকে মহাশূন্যে ক্রমশ বাড়িয়ে দিলে তা গিয়ে মিলবে ধ্রুবতারাতে। আবার পৃথিবীর অয়ন গতি আছে। এখন পৃথিবীর অক্ষরেখাটা যদি মহাশূন্যে দিক পাল্টায়, তবে আজ সেটি যে তারায় গিয়ে না পড়ছে, কয়েক হাজার বছর পর সেখানে গিয়ে না পড়ে, পড়বে অন্য তারায়। ফলে আজ যে তারাটি ধ্রুবতারা — চিরকাল সেটি ধ্রুবতারা থাকবে না। এখন যে তারাটি ধ্রুবতারা হিসাবে দেখি তা হল ∝ - Ursa Minor বা লঘু সপ্তর্ষি মণ্ডলের উজ্জ্বলতম তারা। কিন্তু নথীপত্র ঘেটে দেখা যায় মিশরের পিরামিডগুলি যখন তৈরি হয়েছিল তখন Draco বা অজগর মণ্ডলের ‘থুবন’ নামের তারাটি ছিল ধ্রুবতারা। এখন যে তারাটিকে ধ্রুবতারা বলছি, সে তখন ‘থুবন’ কে কেন্দ্র করে পাক খেত। আজ থেকে প্রায় ১২০০০ বছর পর মণ্ডলের উজ্জলতার অভিজিৎ 'Lyra' হয়ে যাবে ধ্রুবতারা। ছবিতে ফুটকি দিয়ে যে বৃত্তটা এঁকেছি তার উপর যত তারা আছে সবাই কোনও কোন সময় ধ্রুবতারায় পরিণত হবে।

এবার দেখা যাক ঋতু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অয়ন গতির প্রভাব কেমন ভাবে পড়ে।

আচ্ছা আমরা যদি কল্পনা করি ২২শে জুন অর্থাৎ ৭ই আষাঢ় পৃথিবীর বার্ষিক গতিটা হঠাৎ থেকে গেল কিন্তু আহ্নিক গতি স্তব্ধ হয় নি — তাহলে কি হবে বলুন তো! ভাবতে গা শিউরে উঠছে— ভারতবর্ষ তথা সমগ্র উত্তর গোলার্ধে চিরকাল গ্রীষ্মকাল থাকবে। কি অস্বস্তিকর অবস্থা — আপনাকে ভুলে যেতে হবে খেজুর গুড়ের কথা কিংবা চন্দ্রমল্লিকা ফুল — ঠিকই অবস্থাটা প্রায় সেরকমই, তবে শীতকাল আসবে — না, অতটা উৎসাহী হবেন না — আপনার জীবদ্দশাতে আপনি আর মকর সংক্রান্তির পিঠে খেতে পাচ্ছেন না। উত্তর গোলার্ধে আবার শীতকাল আসবে ১৩০০০ বছর পরে। এটা বোঝার জন্য আপনি পাশের ছবিটা দেখুন — বার্ষিক গতি থেমে গেলেও পৃথিবীর অয়ন গতিটা রয়েছে। তাই ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর কক্ষতলের উপর লম্বের চারিদিকে হেলে যাওয়া লাটিমের মতো পাক খাবে শঙ্কুর আকারে। ১৩০০০ বছর পরে পৃথিবী চলে আসবে ২নং অবস্থানে তখন উত্তর গোলার্ধে

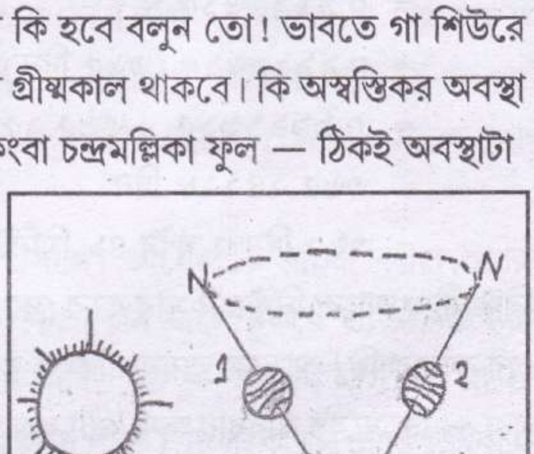

চিত্র:- ৩

শীত আর দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। ২৬০০০ বছর পরে পৃথিবীর মেরুদণ্ড ঘুরে আসবে ১নং অবস্থানে। সুতরাং বার্ষিক গতি বন্ধ হয়ে গেলেও ঋতু পরিবর্তন বন্ধ হবে না — তবে সেক্ষেত্রে ঋতুগুলো হবে কয়েক হাজার বছর লম্বা।

তাহলে আমরা দেখালাম ঋতু পরিবর্তনের জন্য দায়ী পৃথিবীর বার্ষিক গতি এবং অয়ন গতি। এখন বলুন তো ঋতু পরিবর্তনের কাল চক্রটা অর্থাৎ এক গ্রীষ্ম থেকে পরবর্তী গ্রীষ্মকাল আসতে সময় কত লাগবে? যদি ধরে নেওয়া যায় পৃথিবীর অয়ন গতি নেই তবে সময় লাগবে ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা ৯ মিনিট ৯.৫ সেকেণ্ড, যা হল সাইভেরাল ইয়ার (S.Y)। আবার যদি বার্ষিক গতিটা না থাকত তবে সময় লাগত ২৬০০০ বছর কিন্তু তা তো হবার নয়। বাস্তবে দুটো গতিই একসঙ্গে বর্তমান। তাহলে সময়টা কি হবে? — ২৬০০০ সাইডেরাল বছরে। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরবে ২৬০০০ বার কিন্তু ঋতু চক্রের আবর্তন অর্থাৎ এক শীত থেকে আর এক শীত এই আবর্তন ঘটবে ২৬০০১ বার। এখানে ১টা ঋতুচক্র বেশি হবে অয়ন গতির জন্য — এর ফলে কি হবে? এর ফলে ঋতু চক্রের আবর্তন কাল, বার্ষিক গতির চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি হবে। আমরা জানি ঋতু চক্রের আর্বতন কালের নাম Tropical Year (T.Y)

অতএব

$$২৬০০০\ S.Y = ২৬০০১\ T.Y.$$

$$১\ T.Y = \frac{২৬০০০}{২৬০০১}\ S.Y.$$

$$= ০.৯৯৯৯৬১৫\ S.Y$$

= ০.৯৯৯৯৬১৫ (৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা ৯ মিঃ ৯.৫ সেঃ)

= ০.৯৯৯৯৬১৫ × ৩৬৫.২৫৬৩৫৯৯ দিন

= ৩৬৫.২৪২২৮ দিন

= ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৫৩ সেকেণ্ড (প্রায়)

বিজ্ঞানীরা আরো নিখুঁত হিসাব করে দেখেছেন ওটা হয় ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিঃ ৪৬ সেকেণ্ড এর কাছাকাছি। আসলে অয়ন গতিতে আবর্তন কাল ঠিক ২৬০০০ বছর নয়, তার চেয়ে একটু কম — হিসেবের সুবিধার জন্য ওটা ধরা হয়েছে। তাহলে দেখা গেল অয়ন গতির জন্য পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে এক পাক ঘোরার প্রায় ২০ মিনিট আগেই ঋতুচক্র শেষ হয়ে যায়।

এরপর একটু আলোচনা করা যাক ক্যালেণ্ডার প্রসঙ্গে। সারাবিশ্বে যে ক্যালেণ্ডার অনুসরণ করে কাজকর্ম চলে তা হল ইংরেজি ক্যালেণ্ডার — এর আসল নাম কি বলুন তো? Gregorian Calender কেন এমন নাম — পোপ Gregory XIII এর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৫৮২ সালে ইংরেজি

ক্যালেণ্ডারে ব্যাপক সংশোধন করা হয়। সেই জন্যই এই নাম। এই সংশোধনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল অধিবর্ষ বা Leap Year এর ধারণায় সংশোধন। আগের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি চতুর্থ বছরটা হবে অধিবর্ষ — তাহলে ৪০০ বছরে কটা Leap Year হবে বলুন তো? নিয়মানুযায়ী ১০০টি হওয়া উচিত, তাই না ! কিন্তু তা নয়। পোপ Gregory XIII এর সংশোধন অনুযায়ী তা হল যদি কোন বছরের শেষ দুটো অংকই শূন্য হয় তবে ৪ দিয়ে নয় ৪০০ দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগশেষ শূন্য হলে সেই বছরটি অধিবর্ষ হবে। সেই জন্যই ২০০০ সাল Leap Year কিন্তু ২১০০, ২২০০ বা ২৩০০ সাল অধিবর্ষ নয়। এই জন্যই ৪০০ বছরে ৩টা Leap Year কম। তাহলে ৪০০ বছরে মোট দিন সংখ্যা = ৩৬৬ × ৯৭ + ৩৬৫ × ৩০৩ = ১৪৬০৯৭ দিন।

অতএব, গড় বর্তমান = $\frac{১৪৬০৯৭}{৪০০}$ দিন।

= ৩৬৫.২৪২৫ দিন।

= ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৯ মিঃ ১২ সেঃ

তাহলে এটা L এর সঙ্গে প্রায় সমান এবং সেই কারণেই ইংরেজি ক্যালেণ্ডার এত ঋতুনিষ্ঠ — এবং সেই কারণে চিরকাল উত্তর গোলার্ধে ডিসেম্বর মাসে শীতকাল থাকবে। এ প্রসঙ্গে আর একটু কথা বলে নিই — ইংরেজি ক্যালেণ্ডারের বর্তমান নাম 'গ্রেগরীয়ান' হলেও পূর্বে এর নাম ছিল 'জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার'। রোমান সম্রাট জুলিয়াস সীজার এই ক্যালেণ্ডারের প্রচলন করেন। এই ক্যালেণ্ডারে প্রতি চতুর্থ বৎসরই লিপইয়ার ছিল যার ফলে গড় বর্ষমান ছিল ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা। যখন জানা গেল যে ঋতুচক্রের আবর্তন কাল তার চেয়ে প্রায় ১১মিনিট ১৪ সেকেণ্ড কম তখন (না ঠিক তখন নয়, তার অনেক পরে) Leap Year — এর সংখ্যা কমিয়ে এনে বর্ষমান ছোট করে Tropical Year এর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল। এ সংস্কার হয়েছিল ১৫৮২ সালে পোপ গ্রেগরীর আমলে।

এরপর আলোচনা করা যাক বাংলা ক্যালেণ্ডার প্রসঙ্গে। জানেন কি বাংলা ক্যালেণ্ডারের অধিবর্ষের ব্যাপার আছে। তবে অধিবর্ষের অতিরিক্ত দিন কোন মাসে ঢুকবে তা নির্দিষ্ট ভাবে বোঝা যায় না (আসলে বাংলা সব মাসের দিন সংখ্যা নির্দিষ্ট নয় — আশ্বিন মাস ৩০ বা ৩১ দিনের হতে পারে, আবার জৈষ্ঠ্য মাস ৩১ বা ৩২ দিনের হতে পারে) বাংলা ক্যালেণ্ডারে অধিবর্ষের সংখ্যা একটু বেশী। ৪০০ বছরে Leap Year এর সংখ্যা ১০৩টি। সুতরাং বাংলা ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ৪০০ বছরে দিনসংখ্যা = ১৪৬১০৩ দিন। অর্থাৎ গড় বর্ষমান = ৩৬৫.২৫৭৫ দিন = ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা ১০ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড। এই মান Sideral Year এর সঙ্গে প্রায় সমান। সেই জন্য বাংলা বছরগুলি ইংরাজী বছরের চেয়ে প্রায় ২০ মিনিট বড় হয়।

কেন এমনটা হয় বলুন তো। আসলে মানুষ, রাশিচক্রে সূর্যের আবর্তন দেখে Sideral Year এর মান অনেক আগে জেনেছে এবং ঐ Sideral Year এর হিসাব ধরেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ক্যালেণ্ডার তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বহু পরে মানুষ যখন অয়ন গতির কথা জানল এবং তার সঙ্গে জানল Tropical Year এর কথা, তখন কোন কোন ক্যালেণ্ডার যেমন ইংরেজি ক্যালেণ্ডারের সংশোধন করা হয়েছিল। কিভাবে সংশোধন করা হল — অধিবর্ষের সংখ্যা কমিয়ে বর্ষমানটা Tropical Year এর সঙ্গে সমান করা হয়েছিল। যে কাজটা করা হয়নি বাংলা ক্যালেণ্ডারে। এর ফলে অসুবিধাটা কি হচ্ছে বলুন তো? ব্যাপারটা বেশ মজার। বর্তমানে বর্ষাকাল হল আষাঢ়-শ্রাবণ মাস, কিন্তু ২০০০ পর দেখা যাবে সময়টা পাল্টে গেছে। তখন জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাস্ হবে বর্ষাকাল। কেন এমন হচ্ছে? ঘটনাটা হল বাংলা ক্যালেণ্ডারের বর্ষমানের চেয়ে Tropical Year এর মান ২০ মিনিট কম। ফলে ঋতুগুলি প্রতিবছর ২০ মিনিট আগেই চলে আসে এবং এভাবে ৭০ বছরে ঋতুরা এগিয়ে আসে ১ দিন এবং ২০০০ বছরে এগিয়ে আসে একমাস। আজ থেকে ২০০০ বছর আগে শ্রাবণ-ভাদ্র ছিল বর্ষাকাল। উজ্জয়িনির বিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল, আজ থেকে প্রায় ২০০০ বছর আগে মহাকবি কালিদাস ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাকবি। কালিদাস তার 'মেঘদূত' কাব্যে লিখেছেন এক বিরহী যক্ষের দুঃখের বর্ণনা। সেখানে তিনি বলছেন — বর্ষা আসছে আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়েছে এবং সেই মেঘ আকাশে ভাসতে ভাসতে বলে যাচ্ছে, প্রবাসী বিরহী যক্ষ তার প্রিয়ার জন্য ভীষন ভাবে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিভাবে সে তার প্রিয়াকে মনের কথা জানাবে। কবি বলছেন, যক্ষ মনে মনে কল্পনা করছে যদি ঐ ভাসমান মেঘকে দূত হিসাবে প্রিয়তমার কাছে পাঠানো যেত । — সে যাই হোক, আমার সমস্যাটা হল কবির বর্ণিত সময়টা নিয়ে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুযায়ী কালিদাসের সময়ে বর্ষাকালের সূচনা হওয়া উচিত শ্রাবণের প্রথমে বা আষাঢ়ের শেষে — অথচ তিনি বলছেন — "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে ....." এখানে "প্রথম" শব্দের অর্থ কি প্রথম (অর্থাৎ, শুরু) হবে? আমার অবশ্য সংস্কৃতের জ্ঞান কম। যাই হোক — পৃথিবীর অয়ন গতি হল প্রাকৃতিক ঘটনা এবং কয়েক শত বছর আগে বিজ্ঞানীরা তা আবিষ্কার করে ছিলেন — আবার এটাও ঠিক ভারতীয় ক্যালেণ্ডার গুলো পৃথিবীর অয়নগতির ফলাফলের ভিত্তিতে সংশোধিত হয়নি। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে কালিদাসের সময়ে বর্ষাকাল শুরু হত আষাঢ়ের শেষে এবং আমার মনে হয় কালিদাস অকারনে মিথ্যে কথা বলতে যাবেন না — সুতরাং হয়তো আলোচ্য 'প্রথম' কথাটির অর্থ হল 'শেষ' অর্থাৎ আষাঢ়ের শেষ দিন। তারমানে শ্রাবণ ভাদ্র বর্ষাকাল। এভাবে ১৩০০০ বছর পর ঋতুচক্র ৬ মাস এগিয়ে আসবে অর্থাৎ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে শরৎকাল হবে আর আশ্বিনে হবে বসন্ত এবং ২৬০০০ বছর পর সব এখনকার মতো হবে।

আবার দেখুন শীতকালে সূর্য দক্ষিণ আকাশে হেলে যায়। সর্ব দক্ষিণে সে যায় ৭ই পৌষ। আবার ধীরে ধীরে উত্তরে আসতে আসতে সবচেয়ে উত্তরে আসে ৭ই আষাঢ়। এই উত্তরায়ণ-দক্ষিনায়ণের কালচক্রটা কত? এটা হচ্ছে ১ Tropical Year। কারণ এর জন্যই ঋতুচক্র। তাহলে উত্তরায়ণ শুরুর দিনটাও বাংলা তথা অন্যান্য ভারতীয় ক্যালেণ্ডারে প্রতি ২০০০ বছরে ১ মাস করে এগিয়ে আসবে। এখন ঐ দিনটা ৭ই পৌষ। কিন্তু ১৫০০ বছর আগে ওটা ছিল মাঘ মাসের শুরুতে, তখন মাঘ থেকে শ্রাবণ ছিল সূর্যের উত্তরায়ণ আর ভাদ্র থেকে পৌষ পর্যন্ত ছিল দক্ষিনায়ন। মহাভারতে তাই দেখা যায় শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম মাঘ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, সূর্যের দক্ষিণায়ন কালে মরে গেলে স্বর্গে যাওয়া যাবে না বলে।

যাই হোক পৃথিবীর অয়ন গতি যে আছে তার অনেক প্রমান আছে। সে কথা থাক, আসল কথা হল শিক্ষার্থীদের যদি অয়ন গতি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে তারা না হয় বুঝুক পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে একপাক ঘোরার মিনিট কুড়ি আগেই ঋতুচক্র শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ড নয়, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরে ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা ৯ মিনিট ৯.৫ সেকেণ্ডে। এটুকু সত্যি কথা তো তাদের বলাই যায় — তাই না।

তথ্যসূত্র ঃ

১। New UNESCO Source Book for Science Technology - 1973.

২। "বন্ধুপ্রতিম" — ডাঃ শুভাশিষ পাত্র

৩। New - Ready Reckoner

Implementation of ICT in Education

Prof. Rajendra Prasad Kar

To Change traditional way of teaching implementing the use of multimedia tecnologies such as Video, images, animation and visual effects etc. ICT in education improves engagement and knowledge retention. When ICT is integrated into lessons, students become more engaged in their work. This is because technology provides different opportunities to make it more fun and enjoyable in terms of teaching The Same Things in different ways. ICT is broadly Catagorized into four sections based on their applicability. They are computing and information system, Broadcasting, Tele-Communication, internet system.

Information and communication Technology plays a role on three fundamental aspects of education - access, quality, cost. It has advanced knoledge by expanding and widening access to education by improving the quality of education and reducing its cost while extending the education to the remote areas through vistual media, e-learning, online learning platformn i.c. google meet, zoom, google class-room etc. It encourags independent and active learning and self-responsibility for learning. Broadband, 4G, 5G, Wifi technologies support the reliable and uninterrupted downloading of web-hosted educational multimedia resources. various educational institutes have the facilities of eslam, e-book, e-journal For ICT Parents are more likely to be engaged in the school community. over the pase few decades we used Blackboard but now we are using interactive white board as Digital Smart board common CRT monitor now replaced by ultra HD monitor, Radio is now replaced with podcast, hand made slide is replaced by digital projection panel or power point slides. Paper books now become e-book, pdf etc, Face to face communication become online or group or forum communication. The change that we have all born witnessed represent a significant period in our lives. For myself, these changes have been technological in their nature with most of the world in lockdown, due to Pandemic people are working from home is they can, students are learning from home in an online format and parents are also support their children. This unprecedented event has changed the world and has bought it, into a new car - The time of online learning or ICT bored learning for all.

Information can come in many forms such as sound, video, text and image, so we can access there aspects of information by such technology as mobile phones, digital cameras, video cameras, computers. E-learning or online learning is be coming in erea ingly popular for any time and any where. Students with special needs are no longer at a disadvantage as they have access to essential material and special ICT tools can be used by students to make use of ICT for their own educational needs.

The digital divide affects many nations of the developing world. A lack of necessary computer. and interned skills and a lack of english language proficiency that hinder expension and use of digital information resources. Playing online games, fb, whatsapp, youtube, tick-talk are not only important digital resources but they Icill the time of human being and mislead them. We need to pay positive attitude to wards ICT s facilities in educational institution. We have to upgrade both teacher and students with this system. Therefore we need to arrange workshop, Seminer project on ICT baned education and its implimentation in School education. Each and every School, colleges need to have their own virtual library, e-book, e-notes, recorded class video, ppt presentation on these specific postal. Even there should be enough self evaluation scope through ICTs. We Should have to aware our people to the swayam prabha that has been conceived as the project for telecasting high quality educational programmes through 32 DTH channels on 24x7 basis.

মধ্যবিত্তের পাঁচালী

মৌমিতা সিনহা মহাপাত্র

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করার বড়োই বালাই। না পারা যায় নীচে নামতে না পারা যায় উপরে উঠতে। না পারা যায় আগল খুলে বড়কে প্রবেশ করাতে, না পারা যায় বাতায়ন দরজা বন্ধ করে বদ্ধ ঘরে মরতে। না পারা যায় সবকিছু ঝেড়ে ফেলে সমানের দিকে আগানো, না পারা যায় সকল বোঝা নিয়ে বাঁচা। সমস্ত কিছুর মাঝখানে যেন ঘূর্ণাবর্তের আবর্তে ঘুরতেই থাকি। কথায় বলে গোল নাকি সঠিকতাকে নির্দেশিত করে। কিন্তু মধ্যবিত্ত জাতি হয়ে কেবলমাত্র ঘূর্ণাবর্তের মতো ঘুরেই যাই বৃত্তের দুইটা বিন্দু কিছুতেই মেশে না। কেবলমাত্র জটিলতার চক্রব্যুহ রচনা করে যাই। ফল স্বরূপ সেই চক্রব্যূহের মধ্যে নিজের ধর্মের দ্বারা নিজেই বধ হই। নিম্নবিত্ত হলে বিচার করবার কেউ নাই। তাই বিশেষ ভাবনার বালাই নাই। আবার উচ্চবিত্তের ভাবার সময় নাই। মাঝখানে পড়ে থাকে মধ্যবিত্ত যাদের ভাবা, লোকে কী ভাববে তা ভাবা, অনুমান বিচার এবং তৎপরবর্তী বিচার ইত্যাদি প্রধান কাজ। কাজ ঠিক কি ভুল তার ময়নাতদন্ত করতে করতে সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। অথবা ভুল হলেও আর শুধরানোর উপায় থাকে না। বাকী যা পড়ে থাকে তা হল ভুলের মাশুল গোনা যা মধ্যবিত্ত নামক শ্রেণি খুব ভালো ভাবেই করে থাকে।

আবার অন্যভাবও দেখা যায় আরব বেদুইন হবার বাসনা পোষণ করেও মধ্যবিত্ত মরুভূমিতে গিয়ে কোনো অন্তসলীলা ফল্গু ধারার অভিপ্রায় করে থাকে। তারা মরুভূমিতে পদার্পন করার পূর্বেই মরুদ্যান এর খোঁজ করে থাকে। ফলশ্রুতি কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। শেষ পর্যন্ত হয় চোরাবালির শ্রোতে হারিয়ে যায় অথবা ধূ ধূ বালিভূমে মরীচিকার নেশা তাকে গ্রাস করে থাকে। যা অনুমেয় কিন্তু ভয়ংকর।

বাস্তব সত্যি এটাই। বেশিরভাগ মধ্যবিত্তের জীবন পাঁচালী। আমি তাই বুঝিয়েছি আমার মনকে আকাশ তুই ছুঁতে পারবি না জানালাটা খোলা থাক স্বপ্ন গুলোই আকাশ ছুঁয়ে ফিরে আসুক। দরজাটা না হয় বন্ধই থাকুক। একদিন অচলায়ন ভাঙবেই, সেদিন চার দেওয়ালই থাকবে না, দরজা তো কোন ছার। যদি দাঁড়িয়ে থাকতে চায় তবে কঙ্কালসার হয়ে থাকুক তাকে আর মানে কে? বাকি রইল মরুভূমি মনের মধ্যে থাকা ফল্গুধারাটাও যদি শুকিয়ে যায় তাহলে তুই থাকবি কি নিয়ে। তার চেয়ে থাক আরব বেদুইন হয়ে কাজ নেই। ভিতরে বাইরে মরুভূমির কোনো প্রয়োজন নেই।

তারপর সেই মধ্যবিত্ত জীবনের রেশ ধরে ফিরে আসা যার নামকরণ করা হয় অপেক্ষা, অপেক্ষমান থাকুক আমার স্বপ্ন, আমার অনুভূতি, আমার আকাশ, আমার বর্তমান আমার সকল ভবিতব্যের হাতছানি। ইচ্ছা শুধু একটাই অপেক্ষারা যেন অন্তহীন না হয়। তারা যেন আক্ষেপের কোলাহলে হারিয়ে না যায়।

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় করোনা মহামারীর প্রভাব

বিকাশ ব্যানার্জী (প্রথম বর্ষ)

মানুষ যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের জীবন যাত্রাকে উন্নত থেকে উন্নততর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখনই প্রকৃতির বুকে নেমে এসেছে অভিশপ্ত করোনা মহামারী। এবার মানুষ বুঝতে পারছে প্রকৃতির বুকে ধ্বংসাত্মক শক্তির কথা। মানুষ বুঝতে পেরেছে প্রকৃতির মধ্যে একদিকে রয়েছে শুভ শক্তি আর একদিকে রয়েছে ধ্বংসাত্মক শক্তি। এই করোনা মহামারী হল প্রকৃতির বুকে ধ্বংসাত্মক শক্তি। এই করোনা মহামারী প্রকৃতির বুকে বিজ্ঞানের অভিশাপ হিসেবে রেখে এসেছে। এখন মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর গর্ব করলেও বুঝতে পেরেছে প্রকৃতির কাছে মানুষ চিরদিনই অসহায় ছিল এবং প্রত্যেকের মনে এখনো পর্যন্ত একটাই আশঙ্কা যেন ওই করোনা মহামারী পরিবারে কোনো প্রাণ কেড়ে নেবে।

'করোনা' শব্দটি ল্যাতিন শব্দ 'করোনার' থেকে এসেছে যার অর্থ হল মুকুট। আবার গ্রিক ভাষায় করোনা শব্দের অর্থ হল মালা বা পুষ্পস্তবক। মানবজাতির কাছে আতঙ্কের আরেক নাম হল করোনা। করোনা নামটি দিয়েছেন বিজ্ঞানী ও গবেষক ডেভিড ঠাইরোন ও জুন আলমিদা। এরাই প্রথম করোনা ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করেন।

'করোনা' ভাইরাসের অপর নাম হল কোভিড -১৯। অনেকে মনে করেন ২০১৯ সালে করোনার আর্বিভাব হয়। কিন্তু না বহু বছর আগেই করোনার আর্বিভাব হয়। মুরগীর দেহে প্রথম করোনা ভাইরাস দেখা দিয়েছিল তারপর বহু বছর পর মানব দেহে করোনা ভাইরাস সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম অনুযায়ী পাওয়া খবর অনুযায়ী চীনের উহান প্রদেশে একটি বিপনন কেন্দ্রে এই ভাইরাসটি মানবদেহে ছড়িয়ে পড়ে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের অর্থনীতি অনেকটা পিছিয়ে। আরও করোনার ফলে ভারতের অর্থনীতি পিছিয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা চর্চার গতিপথ। সাধারণ গরিব মানুষের কাছ থেকে চলে গেছে আর্থিক স্বচ্ছলতা। করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে বহুদেশ ঘোষণা করেছিল লকডাউন এবং ভারত ও তার ব্যতিক্রম করেনি। এর ফলে মানুষ কাজকর্ম হারিয়ে ঘরে বসে বেকারত্ব হয়ে গিয়েছিল। শ্রমজীবী মানুষেরা যারা দিন আনে দিন খায় তাদের অবস্থা খুব ভয়াবহ হয়ে গিয়েছিল। তারা অপেক্ষার দিন গুনছিল কবে আরও সেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে? এই রকম পরিস্থিতিতে ডাক্তার, নার্স, পুলিশ সহ অন্যান্য কর্মচারীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশবাসীদের সেবা করেছিলেন।

করোনার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল শিক্ষাব্যবস্থা। দীর্ঘদিনের স্কুল, কলেজ বন্ধ থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা লাটে উঠেছে। স্কুলের ঘন্টা, প্রার্থনা, ক্লাস এসব থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা

দূরে ছিল। বহুদিন স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ অনেক কমে গিয়েছিল স্কুলের মধ্যে তালাগুলিতে জং ধরে গিয়েছিল, স্কুলের প্রাঙ্গনে আগাছায় ভরে গিয়েছিল। অনলাইনে পড়াশোনা হলেও তা শহর গ্রাম নির্বিশেষে বহু শিক্ষার্থী তা কোনো ক্লাসই করতে পারেনি। দেখা গেছে ৭০ শতাংশের মতো শিক্ষার্থী অনলাইনে পড়াশোনা করতে পারেনি।

আমাদের দেশে অনলাইনের সুবিধা থাকলেও বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীরা অনলাইনের সুবিধা পায়নি। তাই অনলাইনে পড়াশোনা থেকে তারা দূরে ছিল। তবে এটা ঠিক যে করোনা যদি না আসতো তাহলে ইন্টারনেট কীভাবে পড়ানো হয় সে ব্যাপারে কেউ কিছু জানতো না। তাহলে অনলাইনে শিক্ষা আমাদের কাছে একটা অলৌকিক স্বপ্ন হয়ে রয়ে যেত। করোনার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন এসেছে। সরকার বিভিন্ন চ্যানেল। রেডিও, টেলিভিশন, হোয়াটসঅ্যাপ গুগলমিঠের মাধ্যমে মাসে মাসে বিভিন্ন ক্লাস, অ্যাসাইমেন্ট এর মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রকে চালু রাখার চেষ্টা করেছে কিন্তু তা পুরোপুরি সার্থক করতে পারেনি কারণ অনেক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী অনলাইন সম্পর্কে জানে না তাই তারা এই সুবিধা নিতে পারেনি। ক্লাসের মধ্যে যেমন মুখোমুখি কোনো বিষয় সম্পর্কে সমাধান করতে সক্ষম হয় কিন্তু অনলাইনের মধ্য দিয়ে তা সক্ষম হয় না। অনেক সময় সার্ভার প্রবলেম হয় তার ফলে অসুবিধা হয়। তাছাড়া প্রত্যেকের হাতে স্মার্টফোন বা ইন্টারনেট এর সুবিধা নেই তার ফলে তারা অনলাইন পড়াতে পারছে না এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের খুব বড়ো ক্ষতি হচ্ছে। করোনা কালের মধ্যে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ কমে গেছে। লকডাউনের সময় অনেক শিক্ষার্থী গরীব ঘরের তারা অভাবের জন্য কাজে চলে গেছে করোনার পর যখন স্কুল কলেজ খোলা তখন তাদের আর স্কুল, কলেজ যাওয়ার মনোযোগ থাকে না। করোনার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকের ক্ষতি হয়।

বর্তমান সরকার এখন করোনার টীকা প্রদানের মাধ্যমে সমস্ত স্কুল, কলেজ গুলিতে করোনার প্রথম টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। প্রত্যেক স্কুল, কলেজগুলো খোলার ব্যবস্থা করেছে।

সবশেষে বলা যায় করোনা ভাইরাস একশো বছরের বিশ্ব ইতিহাসের এক বড়ো অভিশাপ হয়ে রয়ে গেছে। মানুষের সচেতনতাই পেরেছে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ দিয়ে এই অভিশাপ কেটে গেছে। আর সাধারন মানুষ পেয়েছে এক নতুন আনন্দময় জীবন।

●

" Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely". — ***Lord Acton***

কোভিডের ফলে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন

সায়নিক মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)

বর্তমান দিনে আমরা গোটা পৃথিবীবাসী কোভিড (COVID 19) সম্পর্কে পরিচিত। কোভিড ১৯ অর্থাৎ করোনা ভাইরাসের মারনমুখী সংক্রমণে পুরো মানবজাতি তটস্থ। সংবাদমাধ্যম থেকে আনুমানিক ভাবে জানা যাচ্ছে যে চিন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করোনা ভাইরাস সংক্রমনের জন্য দায়ী। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে করোনা ভাইরাস হাঁচি, কাশি এবং স্পর্শের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয় তাই সরকারি স্তর থেকে কঠোর নিয়মকানুন ও লকডাউন এর ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে জনসমাগমসম্পন্ন এলাকা অর্থাৎ সিনেমা হল, জিম, সপা, রেস্টুরেন্ট সর্বোপরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্কুল কলেজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। তাই এই মারণ ভাইরাসের ফলে আমাদের প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়।

করোনা সংক্রমণের আগে আমরা আমাদের প্রথাগত ক্লাসরুমভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থাতে অভ্যস্ত ছিলাম। সেই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী ক্লাসে নির্দিষ্ট সময় প্রবেশ করত। তারপর প্রার্থনা সঙ্গীত এর মধ্য দিয়ে দিনের শুভ সূচনার মাধ্যমে ক্লাস শুরু হত। শিক্ষক শিক্ষিকারা তাদের নিজস্ব বিষয়ে পাঠদানের দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করতেন। ছাত্রছাত্রীরা তাদের জিজ্ঞাসু মনোভাবের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের দ্বারা তাদের জ্ঞানের সম্পূর্ণতা ও মনের তৃপ্তি বাড়ত। এছাড়াও বন্ধুদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা এর মাধ্যমে তারা শিখত এবং বন্ধুদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মজা ক্লাসের মধ্যে আলাদা আনন্দ এর পরিবেশ তৈরি করত। দীর্ঘ একঘেয়ামি ক্লাস চলার সময় প্রত্যেক ছাত্র অপেক্ষা করে, স্কুল ছুটির শেষে মাঠে খেলাধূলা করার। বিকেল বেলায় মাঠে শিশুর হাসি, সেই পুরো দিনের ক্লান্তি যেন ভুলিয়ে দেয়। সূর্য ডোবার পর আগামী দিনের স্কুলের কাজের প্রস্তুতিপর্ব শেষ করে প্রত্যেক ছাত্র রাত্রে বেলায় শান্তিপূর্ণভাবে ঘুমিয়ে সকালের শুভ সূচনা করে।

করোনাভাইরাস আগমনের পর পুরো শিক্ষাব্যবস্থা অনলাইন মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে। তাই বর্তমানে আমরা অনলাইন মাধ্যমের সাথে বেশি পরিচিতি হয়েছি। আগে যে ক্লাস শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সামনে ছাত্র বসে করত তা অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সেই ক্লাস এখন মোবাইল স্কিনের সামনে হচ্ছে Google Meet, Zoom, Teachmint ইত্যাদি অ্যাপের মাধ্যমে। উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও বিভিন্ন ধরণের Software এর মাধ্যমে এই অ্যাপ বানানো হয়। অ্যাপটিকে খুব চিন্তা-ভাবনা করে তৈরি করা হয় যাতে ক্লাসরুমের মতো একটি ছাত্র সুবিধা পায়। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার শিক্ষককে উত্তর জানাবার সহ আরও বিভিন্ন সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য দিয়ে এগুলিকে আকৃষ্টজনক করা হয়েছে। এগুলি ব্যবহার করাও খুব সহজ। ক্লাসে শিক্ষক যেমন চক ও ডাস্টার ব্যবহারের

দ্বারা পঠনকার্য করেন তেমনি যথাযথভাবে বিজ্ঞান অ্যাপে মোবাইল বা ল্যাপটপের স্কিনে Digital Pen এর দ্বারা শিক্ষামূলক অ্যাপে পাঠদান হয়।

এছাড়াও মোবাইল এর প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর অধিক আগ্রহের জন্য তারা কোভিড পরবর্তী Digital Study বা অনলাইন ক্লাসের প্রচলনকে অতিদ্রুত মানিয়ে নিয়েছে।

আকস্মিকভাবে কোনো কিছু পরিবর্তনের ফলে পরিস্থিতির কিছু সুবিধাজনক ও অসুবিধাজনক দিক থাকবেই। এই অবস্থাও তার ব্যাতিক্রম নয়।

করোনাভাইরাস আগমনের ফলে মোবাইল অনলাইন ক্লাসে পড়াশোনাকে আরও আকৃষ্টজনক করা হয়েছে। কোনো বিষয়ে পড়ার পাশাপাশি সেখানে ঐ বিষয় সম্বন্ধীয় Visual effect, Digital image বা living Graphic দিয়ে ঐ বিষয়কে সৃজনশীল চিন্তাভাবনার সাহায্যে দেখানোর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীর আগ্রহকে শতগুনে বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও একঘেয়ামি দূর করার জন্য Digital Classroom এ ব্যাকগ্রাউণ্ড পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্লাসরুমকে অসাধারণভাবে সাজানো হয়। এছাড়াও কোনো ছাত্র অনুপস্থিত থাকলে Recorded lecturer এর মাধ্যমে ঐ ছাত্র তার পড়াশোনাতে মনযোগ দিতে পারছে। এমনকি ইন্টারনেটের ফলে শিক্ষক বা ছাত্র তাদের নিজের সময়মতো ক্লাস করার সুযোগ পাচ্ছেন। অনলাইনে ক্লাসের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা অবসর সময়ও বেশি পায় প্রথাগত ক্লাসের তুলনায়, সেই ফাঁকা সময়ে তারা নিজেদের বিভিন্ন শখ সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের জীবনধারণের মানকে উন্নত করবে। এমনকি করোনা আগমনের ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সামান্য হলেও স্বাস্থ্য সম্পর্কেও সচেতন হয়েছে। অবসর সময়ে তারা স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করছে। শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে এই অবসর সময় আমাদের যথাযথভাবে সাহায্য করেছে মানসিক ও শারীরিকভাবে বিভিন্ন কাজ করার ক্ষেত্রে।

কিন্তু "Each Coin has two sides" প্রত্যেক পরিস্থিতির কিছু খারাপ দিক তো থাকবেই। যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতন নয় তারা এই সুযোগকে নেতিবাচকভাবে কাজে লাগিয়েছে। অনলাইনে ক্লাস করার সুযোগ নিয়ে তারা বিভিন্ন প্রকার গেম এ আকৃষ্ট হয়েছে। তারা গেম খেলার মাধ্যমে ছাত্রজীবনের মূল্যবান সময়কে দিনের পর দিন অবহেলায় কাটিয়েছে।

এছাড়াও টানা অনলাইন ক্লাসের জন্য চোখের সমস্যা, ঘাড়ের সমস্যা ও বিভিন্ন ধরনের শরীর সম্বন্ধে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে মানবজাতি। এছাড়াও হাতে মোবাইল ও অবসর সময় পেয়ে Netflex এ সিনেমা দেখার আনন্দের মধ্য দিয়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রী এই মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে। অন্যদিকে দেখতে গেলে যে সব ছাত্র-ছাত্রীর বাড়ির আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয় তারা এই করোনার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

এই পরিস্থিতির শিকার সবাই, তাই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের সুবিধা ও অসুবিধা দুটোই

বর্তমান। কিন্তু তা বলে এই নয় যে আমরা নীরব দর্শক। আমরা যদি চাই, এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা থেকেই অনেক নতুন কিছু শিখতে পারব। "প্রকৃতির নিয়মেই হল পরিবর্তন" - তাই এই পরিবর্তন মানিয়ে নিয়ে আমাদের সফলভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

◆

"আমাকে একটু আলোক দাও ঃ রোদ মাতাল ভোর একটু দাও মুক্ত হাওয়া রুদ্ধশাস এ বুকে,
আমি কী দেব, কি দিতে পারি তোমাকে
শক্তিমান তোমাকে দিই কখানা ভাঙা পাঁজের যত জ্বালা।" — পূর্ণেন্দু পত্রী

পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার

অভিষেক মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)

এই পৃথিবীটাই একটা বড়ো পরিবেশ। আর আমরা এবং আমাদের চারপাশটা তার ক্ষুদ্র অংশ সুতরাং পৃথিবী দূষণ মানেই সমগ্র পৃথিবীর অসুখ। বর্তমান পরিবেশ দূষণই হল বিশ্বের সবচেয়ে উদ্বেগজনক সমস্যা। পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বাতাস, মাটি ও জল। কলকারখানা এবং গাড়ির ধোঁয়া ও কয়লা ও তেলের দহন বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমানকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। রাসায়নিক আর শহরের নোংরা আবর্জনা মাটিকে বিষাক্ত করছে। আর পয়ঃপ্রণালীর জল এবং বর্জ্যপদার্থ নদীর জলকে করে তুলছে দূষিত। এই দূষণের ফলে বাতাসের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। প্রকৃতিতে নানা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। দুই মরু প্রদেশের বরফ গলে যাচ্ছে। বৃষ্টিপাত অনিয়মিত হয়ে পড়ছে। অনেক পশু-পাখির বিলুপ্তি ঘটছে। ফসলের ফলন কমছে, গাছে ফল ধরছে না। এর সঙ্গে মানুষের দেহে বাসা বাঁধছে নানা ধরনের রোগ। পরিবেশ দূষণ রোধ করতে হলে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে। শহরের নোংরা, আবর্জনা, নোংরা জল মাটিতে বা নদীতে ফেললে চলবে না। বাজি, ডিনামাইট, গাড়ির হুণ ইত্যাদির শব্দকে নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রচুর পরিমানে গাছ লাগিয়ে পরিবেশকে রক্ষা করা যায়। কারণ গাছ হল বিশহরি। গাছ বাতাসের বিষ হরণ করে। পরিবেশকে বাঁচাতে না পারলে পৃথিবী থেকে মানুষেরই একদিন বিলুপ্তি ঘটবে।

বর্তমান সমাজ ও সামাজিক অবক্ষয়

কৌশিক প্রতিহার (প্রথম বর্ষ)

"বল বীর বল উন্নত মম শির"

কবিতার কবিতায় শির উঁচু করে বাঁচার কথাই বলে গেছেন। কিন্তু বর্তমান সমাজের বীর, তরুন যুবকরা মোবাইল এর স্ক্রীনে শীর নীচু করেই রাখতে ব্যস্ত। তাহলে সামাজিক অবক্ষয়ের ভগ্ন দশাটা তাদের চোখে পড়বে কী করে।

জানিনা কেন যে আমার মনে হিংসা হয়, পাশের বাড়ির লোকের উন্নতি দেখে। অপরের দোতালার বাড়িটা দেখে ভাবি আমার ছাদটা যেন পাড়ার সবচেয়ে উঁচু হতে হবে। পাড়ার ছেলেটার ডাক্তারি পড়ার প্রবেশিকা পরীক্ষার সফলতাকে কেন যে আমি ছোটো করে দেখতে যে চাই, তার উত্তর অজানা। পাড়ার মেয়েটার বড়ো ঘরে বিয়ে হওয়াটাকে আমি কেন জানি না তার ভাগ্যের সাথে গুলিয়ে দিই। আমি যেন নিজের উন্নতি করা ভুলে অপরের ক্ষতি করে তার থেকে বড়ো হতে চাচ্ছি। আমার মনে দাম্ভিকতার প্রাচুর্য, অর্থের প্রতি অনার্থ লোভ, ক্ষমতার শীর্ষে থেকে ক্ষমতা ভোগের ইচ্ছা জাগে, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়কে জলাঞ্জলি দিয়ে।

এই আমি কে? আমি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি না। আমি বর্তমান সমাজের দৈন্য সমাজব্যবস্থার এক জীর্ন মানব জাতি। এই আমি আর আজ আমি নেই। বিকিয়ে দিয়েছি নিজেদের মেরুদণ্ডকে। গচ্ছিত রেখেছি নিজেদের বিবেক, বোধ, বুদ্ধিকে অর্থের বিনিময়ে তোমাদের কাছে। এবার এই তোমরা কারা? তোমরা হলে এই সমাজের মিডিলম্যান, দালাল, যারা ছলে বলে কৌশলে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কিনে নিচ্ছে মনুষ্যত্বকে। বর্তমান সমাজকে ভাগাড়ে পরিণত করেছে। মানব জাতিকে পরিণত করতে চাইছে অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে। আইন, শৃঙ্খলা, সমাজ ব্যবস্থাকে ধূলোয় মিশিয়ে দিতে চাচ্ছে। সফলও হয়ে যাচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। কিন্তু এতে সমাজের কি হবে? এই নিয়ে কে ভাববে বল। এক অজানা অচেনা ব্যস্ততা গ্রাস করেছে সমগ্র মানব জাতিকে। ছুটে চলেছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে লক্ষহীনভাবে। বেঁচে থাকার কারণ ও লক্ষ্য গুলিয়ে ফেলছে প্রতি মুহূর্তে। বড় বড় উঁচু প্রাসাদ আছে, ঝাঁ চকচকে রাস্তা আছে, জল জাহাজ আছে, সুন্দর সুন্দর শপিং মল আছে, হরেক রকম পোশাক আছে, বিভিন্ন স্বাদের খাবার আছে, মনের মত বেড়ানোর পার্ক আছে, বিনোদনের জায়গা আছে, বন্ধু আছে, বান্ধবী আছে, ফেসবুক আছে, টুইটার আছে, ইনস্টাগ্রাম আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে এক কথায় বলা যায় সবই আছে। কিন্তু মানবতা কোথায়? যেন উবে গেল বর্তমান সমাজ থেকে।

আমরা ক্রমেই এক অনৈতিক সময়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। যেখানে মানবিকতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, দয়া, মমতা এসব শব্দের বালাই নেই। বদলে গ্রহণ করছি অনৈতিকতা, অমানবিকতা,

নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, বিদ্বেষ। বর্তমান সামাজিক অপরাধগুলো খুব ছোট করে দেখছি আমরা, কোন কোন অংশে মেনেও নিচ্ছি। ক্রমশ ভয়াবহ ব্যাধির জায়গা নিচ্ছে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়। সমাজের নীতিনির্ধারক বিশিষ্টদের অবহেলায় অবহেলিত হচ্ছে মুষ্টিমেয় মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে চাওয়া মানুষগুলো। তারা মানিয়ে নিতে পারছে না বর্তমান সমাজের সাথে নিজেদের। খাপ খাওয়ানোর চেষ্টাতেও বিফল তারা। তারা আজ বিলুপ্তির পথে। বিশ্বাসহীনতা, বিষন্নতা তাদের গ্রাস করছে প্রতি মুহূর্তে। তাদের মানসিকতা ও কর্মকাণ্ডে প্রতিফলন ঘটছে। তারা সমাজকে কলুষিত মুক্ত করার প্রতিষেধক খুঁজছে প্রতি মুহূর্তে। তারা নিজেদের সামাজিক নিরাপত্তা ও অধিকার বজায় রাখার জন্য সমাজকে সুস্থতায় ফিরিয়ে আনতে চাইছে। কিন্তু ব্যর্থতার মুখ দেখছে প্রতি ক্ষেত্রে কারণ ঐ যে মিডিলম্যানগুলো।

প্রতিকার আমার হেডিংশ-এ নেই। তবুও বলে যায় - সর্বাগ্রে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, ধর্মীয় অনুশাসন ও অনুশীলন, পরমত সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তুলুন। অশ্লীলতাকে শুধুই বর্জনই নয় প্রতিরোধ করুন। মেরুদণ্ড সোজা করে অন্যায়কে অন্যায় বলতে পারুন বা না পারুন, ন্যায় কে অন্যায়ের তকমা দেবেন না। সর্বপরী শীর উঁচু করে চলুন।

প্রকৃত শিক্ষা বনাম বাজারি শিক্ষা

অভীক মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)

শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি সমাজের জ্ঞান, অভ্যাস রীতিনীতি এবং মূল্যবোধগুলি পরবর্তী প্রজন্মের দিকে বাহিত হয়। এটি সমাজের জীবন ধারার সাথে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো আত্মউপলব্ধি জ্ঞান অর্জন করা, বিবেক, বুদ্ধি, মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করা এবং অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি সমাজ এবং দেশের পাশে দাঁড়ানো। শিক্ষা মানুষের চেতনার মানকে উন্নত করে সৃষ্টিশীল চিন্তাধারার বিকাশ ঘটায়। নতুন কিছু করতে উৎসাহিত করে।

কিন্তু বর্তমানে আমরা যে বাজারি শিক্ষা গ্রহণ করছি তার থেকে উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি কি সাধিত হচ্ছে? আমাদের এই অর্জিত শিক্ষার মাধ্যমে আমরা কি সমাজ এবং রাষ্ট্রের পরিবর্তন ঘটাতে পারছি? এর উত্তর হবে - 'না'। আমাদের চারপাশের পরিবেশের দিকে তাকালে দেখতে পাই সমাজে প্রতিনিয়ত অবক্ষয় বেড়েই চলেছে। সামাজিক এবং নৈতিক বোধ বিনষ্ট হচ্ছে। অরাজকতা, নৈরাজ্য হানা হানি সর্বত্র সব জায়গায় বিরাজমান এর অন্যতম প্রধান কারন হল প্রকৃত শিক্ষার অভাব।

আমরা যখন জন্মাই তখন আমরা সবাই একটা খোলা মন নিয়ে জন্মগ্রহণ করি। সেই মনের ভেতর থাকে না কোনো বিদ্বেষ। সেই মনে থাকে শুধুমাত্র ভালেবাসা। আস্তে আস্তে পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং চারপাশের প্রভাব আমাদের মন পক্ষপাতমূলক ধারণার বন্দী হতে থাকে। প্রকৃত শিক্ষা আমাদের এই পক্ষপাতদুষ্ট চিন্তাধারা ভেঙে দিয়ে খোলা মনে ভাবার সক্ষমতা দান করা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে শিশীর হেরফের শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছিলেন "আমরা যে শিক্ষা আজন্মকাল যাপন করি। সে শিক্ষা কেবল অসামাজিকতাকে চাকরি অথবা কোনো একটি ব্যবসার উপযোগী করে মাত্র।" এই শিক্ষা কেবল ধন উপার্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি সাধনেই ব্যস্ত।

বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব শিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে আমরা বেশ সহজ মানুষের মত হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমান ধরিতে পারি। প্রকৃত শিক্ষা তাই সেটা নয়, যেটা আমরা স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জন করি। একজন শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় ভালো ফল করা প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত তাকে একজন ভালো মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে হবে। আমরা আমাদের পাঠ্যপুস্তকে পড়ি মানুষ বিপদে পড়লে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়। অসহায়কে সাহায্য করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি করি।

আমরা খুব কম মানুষই বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ায় আজ আমরা রাস্তায় কোনো অসহায় মানুষকে দেখলে সাহায্য করার পরিবর্তে সেখান থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করি যাতে কোনো ঝামেলায় পড়তে না হয়। তা সুস্থ মানুষকে মরতে দেখেও সহযোগীতার হাত বাড়াই না। পাশ কাটিয়ে চলে যাই। এর অন্যতম কারণ প্রকৃত শিক্ষার অভাব, প্রকৃত শিক্ষা কখনো কোনো স্কুল, কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি বা মানুষকে দিতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষা হলো সেটাই যেটা প্রকৃতি থেকে অর্জন করা হয়। শিক্ষার সাথে থাকতে হবে সংস্কৃতি, রুচিবোধ, মানবতাবোধ তবেই সেটা প্রকৃত শিক্ষা হবে। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে গেলে মাননীয় গুণাবলী এর বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে হয় নিজের ইচ্ছায় আনন্দের সাথে। আজ আমরা যদি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি বা শিক্ষাঅর্জনের দিকে নজর দিই তাহলে দেখতে পাব তরুণ প্রজন্ম প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে না। আজ আমরা শিক্ষিত হওয়ার জন্য প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার অপেক্ষায় থাকি। সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে ডিজিটাল সিস্টেমে প্রশ্ন কেনাবেচার আশায় থাকি। সার্টিফিকেট অর্জন করার নেশায় থাকি, ঘুষের বিনিময়ে চাকরি পাওয়ার অপেক্ষায় থাকি। আমরা শিক্ষিত হতে চাই বেশি বেশি অর্থ উপার্জন করার জন্য দামী গাড়ী কেনার জন্য, বাড়ি করার জন্য কিন্তু সেটা আমাদের প্রকৃত শিক্ষিত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য স্থায়ী ও শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা ও স্বার্থপরতা তাই বেড়ে ওঠে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সমাজ, দেশ এবং দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে না। এর জন্য অবশ্যই অনেকটা দায়ী আমাদের বাজারি শিক্ষাব্যবস্থা এবং কিছুটা আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। এই বাজারি শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে নষ্ট করছে। প্রকৃত শিক্ষা চর্চা সেখানে সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরনের কারনে নৈরাজ্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষা এখনও একটি বাজারি বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

আসলে প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে বাজারি শিক্ষার অনেক পার্থক্য। বাজারি শিক্ষা একটা সময় পর ডিগ্রি অর্জনের পর শেষ হয়ে যায় কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা আমরা আজীবন শিখতে পারি।

এই বাজারি শিক্ষা সম্বন্ধে কবিগুরুর আরও একটা বিখ্যাত উক্তি আছে - "শিক্ষাকে আমরা বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম।"

সত্যি তাই আমরা প্রকৃত শিক্ষাকে বহন করে সমাজের উন্নতির সাধনে ব্রতী না হয়ে এই বাজারি শিক্ষাকে দিনের পর দিন বহন করে চলেছি 'যার ফলস্বরূপ বর্তমানকালে ব্যক্তি তথা সমাজের ক্রমাগত অবক্ষয়।

একজন মানুষ তাই প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে কিনা বোঝা যাবে যখন তার মধ্যে সততা মূল্যবোধ, সাহায্য করার মানসিকতা অন্যকে কটূক্তি না করে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা, সহনশীলতা ধৈর্য্য, মনুষ্যত্ববোধ এবং সুমিষ্ট ব্যবহার প্রভৃতি গুনাবলী এর প্রতিফলন ঘটবে। শুধুমাত্র ডিগ্রি দেখে একজন মানুষ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে কিনা সেটা বিচার করা যায় না। প্রকৃত শিক্ষা হতে হবে নিজের জন্য। মানুষের মঙ্গলের জন্যও সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য।

গৌতম ও যিশু

শুভাশীষ বেজ (দ্বিতীয় বর্ষ)

আমি যে দুই মহামানবের ব্যাপারে লিখেছি তারা দুই জনই মানবসভ্যতাকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তাদের আগমন, তারা দুইজনই দুটি ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম ও যিশুখ্রিস্ট খ্রিস্টান ধর্ম।

ধর্মের কাজ হল মানুষকে সঠিক পথে চালনা করে। পৃথিবীতে বহুধর্ম প্রচলিত আছে। আঞ্চলিক কিছু ধর্মও আছে। আবার বহুধর্ম পূর্বে ছিল কিন্তু বর্তমানে তার অবলুপ্তি ঘটেছে। আমি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখছি এই দুইজনের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করে দেবেন।

প্রথমে বলি পৃথিবী জুড়ে প্রচলিত কিছু ধর্মের কথা ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, শিখ ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, কনফুসিয়নিজম, কোরিয়ান শামানবাদ, জৈন ধর্ম, ক্যাওড়াইজম, আর রয়েছে বাহাই, ড্রুজ, টটনরিজম প্রভৃতি।

কিন্তু পৃথিবীর সবথেকে প্রাচীন ধর্ম হল হিন্দু ধর্ম। বিজ্ঞানীমহলের তথ্যের আধার অনুযায়ী, গৌতমবুদ্ধও হিন্দু রাজকুমার ছিলেন।

প্রথমে আসি দেবমানব বুদ্ধদেবের ব্যাপারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন কপিলাবস্তুতে, তিনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হল শুদ্ধোধন। তারা ছিলেন শাক্যবংশীয়। সূর্যবংশীয় রাজা ইক্ষ্বাকু যে বংশ সৃষ্টি করেছিলেন সেই বংশের একাংশ হল শাক্যবংশ। রাজা ইক্ষ্বাকুর নাম আমরা গীতাতেও পাই। যখন শ্রীকৃষ্ণ গীতার জ্ঞান ও মাহাত্ম্য অর্জুনকে দিচ্ছিলেন। যাই হোক, বুদ্ধদেবের জন্মানোর আগে তার মাতা অর্থাৎ মায়াদেবী কোনো সন্তান প্রসব করেননি (প্রায় ১১ বছর) একটা ঘটনার বর্ণনা আছে নাকি বুদ্ধ জন্মানোর আগে নাকি তার মাতা এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন একটা শ্বেতবর্ণের সুন্দর হাতি শ্বেতপদ্ম নিয়ে তার উদরে প্রবেশ করছে। রাজজ্যোতিষী এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে রাজার গৃহে কোনো মহামানবের আর্বিভাব হতে পারে। তারপর ধীরে ধীরে সময় যায় মায়াদেবী বাপের বাড়ি যাবার পথে লুম্বিনী বাগানে খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন বুদ্ধদেব। কিন্তু দুঃখের কারণ হল মায়াদেবী মারা যান বুদ্ধদেব জন্মের ৭দিন পর। অন্নপ্রাসনের সময় তার অর্থাৎ (বুদ্ধদেবের) নাম রাখা হয় সবার্থসিদ্ধ। যেহেতু তার আগমনে রাজা ও রানীর সর্বকামনা সিদ্ধ হয়েছিল। সবার্থসিদ্ধ থেকেই নাম হল 'সিদ্ধার্থ' মায়াদেবীর মৃত্যুর পর শুদ্ধোধন সিদ্ধার্থর জন্য দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন মায়াদেবীর বোন গৌতমীকে। গৌতমী শিশু সিদ্ধার্থকে লালন পালন করতেন বলে তার অর্থাৎ বুদ্ধের অপর নাম হল গৌতম। ছোটবেলায় গৌতমের কোষ্ঠীবিচার হয় তাতে পাওয়া যায় গৌতমের সন্ন্যাস যোগ আছে। গৌতম খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা প্রভৃতি ছোট থেকে দেখে মর্মাহত। তিনি এই দুর্দশার কারণ

খোঁজার চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে তিনি তা খুঁজে পেয়েছিলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বৈরাগ্য বাড়তেই থাকে। তা দেখে তার পিতা খুব অল্প বয়সে বিয়ে দেন তার দণ্ডপানি শাক্যের রূপবতী কন্যা গোপা (যশোধরা)। কিন্তু গৌতমের মন থেকে মোক্ষের ইচ্ছাকে দূর করা যায়নি। বিবাহের দশ বৎসর পর এক রাত্রে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি ভবঘুরেরূপে দেশ বিদেশে ঘুরতে থাকেন। তিনি ঘুরতে ঘুরতে গয়া অঞ্চলের উরুবিল্বগ্রামে। এখানেই তিনি দীর্ঘ ৬ বছর কঠোর তপস্যা করে সুকুমার দেহকে কঙ্কালসার হয়ে যায়। তখন তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। এভাবেই ধ্যান ও সমাধির একটি একটি স্তর অতিক্রম করে চললেন। এক সাধনার ছয় বছর পর তিনি লাভ করেন 'বোধিজ্ঞান'। সাধক তখন ক্রমাগত অর্থাৎ যে পথে গমন করলে নির্ধনের পরম বস্তু লাভ হয়। সেই পথের পথিক তিনি হলেন 'বুদ্ধ। তারপর তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। তিনি নতুন সাধন তত্বের কথা বলেন যা অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। তা হল 'সম্যক দৃষ্টি', সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক, সম্যক কমাণ্ড, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক দৃষ্টি স্মৃতি ও সমাধি। এখানে বলা ভালো যে বুদ্ধদেব শিষ্যদের ভিক্ষু বলতেন এক ভিক্ষু সমাজকে সংঘ বলতেন সাধনালাভের পর দীর্ঘ ৪৫ বছর তিনি ধর্মপ্রচার করেন, তার ভাষা খুব সহজ, সরল। বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হল ত্রিপিটক। ত্রিপিটক তিনটি সূত্র বিনয়, অভিধর্ম। বিনয় পিটকে ছিল সন্ন্যাসী হওয়ার পর নিয়মকানুন। এছাড়া বুদ্ধদেবের বহুবার জন্মনিয়ে লেখা হয় জাতকের গল্প। জাতকের গল্পের মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধ মানুষদের শিক্ষা দিতেন। ধর্মপ্রচার করতে করতে একবার তিনি কপিলাবস্তুতে আসেন তখন তার পিতা তাকে দেখে চোখে জল আসে এক ছেলের এই ত্যাগী রূপ দেখে ও হাতে ভিক্ষার বাটি দেখে খুবই দুঃখ পান, কিন্তু বুদ্ধের বাণী শুনে তিনি আশ্বস্ত হন। তিনিই হয়ত প্রথম বাবা যে তার পুত্রকে প্রনাম করেন। তিনি বছরের পর বছর পদব্রজে পরিভ্রমণ করে ধর্মোপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু রাজগীর থেকে কুশীনগরের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ে সেখানে আশ্রয় নেন। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৪ অব্দে আশী বছর বয়সে তিনি মারা যান। বৌদ্ধধর্ম যে সব দেশে চীন, জাপান, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া, হংকং, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, তাইওয়ান, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম ম্যাকুও, লাওস প্রভৃতি দেশে। এক চিনে বিখ্যাত মার্শাল আর্ট এর সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের সম্পর্ক আছে। হিন্দুধর্মে বুদ্ধকে বিষ্ণুর দশাবতারের এক অবতার মানা হয়।

এবার আমি আসি যিশুখ্রীষ্টের ব্যাপারে। এই মহামানবের আর্বিভাবের পর থেকেই সাল গণনা শুরু হয় প্রায় ২০০০ বছরের আগেই তিনি জুডিয়াতে। তার মায়ের নাম মেরী ও পিতার নাম ছিল জোসেফ। জন্মগতভাবে ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তবে শোনা যায় যে তার বাবা ও মায়ের বিবাহের পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবন কাহিনী খুবই করুন প্রকৃতির। জন্মগ্রহণের আগে রোম জুড়ে এক ভবিষ্যৎ বাণী হয় যে নবজাতক শিশুরা জন্মগ্রহণ করছে তাদের মধ্যে একজনের দ্বারা

রোমের রাজার পতন হবে। এই ভবিষ্যৎবাণী শুনে রোমের রাজা সমস্ত শিশুকে মারার জন্য উদ্যত হয়। তখন যিশুর মা মেরী জন অন্তঃসত্ত্বা সেই কারনে ভয়ে ভীত হয়ে যীশুর জন্ম হয়। এক অস্তাবলে। পরে তারা পালিয়ে যায় জডিয়াতে থেকে। এইভাবে ঈশ্বরের সন্তান বেঁচে যান। তবে সত্যি বলতে গেলে অনেকে যিশুর জন্মগ্রহণ নিয়ে নানা মতামত প্রদান করেন। অনেকে বলেন যিশুর পিতা সন, এক পবিত্র আত্মার কারনের যিশুর জন্ম মানে দেবদূতের সাথে মিলনের ফলে। পৃথিবীতে মানুষ জন্ম মানেই পাপযুক্ত। কিন্তু যিশুকে পাপমুক্ত ভাবেই ভাবা হত। যিশু মূর্তিপূজা সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন। তিনি দেশ বিদেশে ঘুরে সহজে সরল ভাষায় শান্তির ধর্ম বোঝাতে থাকেন। বাইবেলে উল্লেখ আছে যে যিশুর শরীরে এক আলাদা ত্যেজ ছিল এবং তার বাক্যতে যে কোনো মানুষ সম্মোহিত হয়ে যেত। একদিন এক মরনাপন্ন শিশুকেও বাঁচিয়ে দেয় জাদু বলে, যিশু প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করে ৩০ বছর বয়সে জোহান দ্য ব্যাপটিস্ট। যদিও জোহানেরও বয়স যিশুর বয়সের সমান। তারপর পৃথিবীতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি মরুভূমির মধ্যে ৪০ দিন কঠিন তপস্যা করেন মানব কল্যানের জন্য। তিনি ইরানেও এসেছিলেন। ধর্মপ্রচার করতে করতে তিনি আবার ফিরে আসেন জেরুজালেমে। সেখানে তিনি মানবতার ধর্ম প্রচার করতে শুরু করলেন। বাধা দিলে মূর্তি পূজা ও মন্দির ভেঙ্গে দেবার কথা বললেন। ভগবান মন্দিরের ভিতর মূর্তি নন। রোমের পুরোহিতরা যিশুকে ভয় পেতে শুরু করল তখন যিশুকে মারার পরিকল্পনা শুরু করল। যিশুর মৃত্যুর আগে এক সপ্তাহে যিশু বুঝতে পারেন যে তিনি আর বেশিদিনের অতিথি নন। তিনি তার শিষ্যদের বললেন আমার আত্মার এবার গতি হবে। তাই বৃহঃস্পতি রাত্রে যিশু শেষ ভোগের ব্যবস্থা করে যা 'The last supper' নামেও যা যিশুর খাওয়ান। খাওয়ার ক্ষেত্রে যিশু তাদের পা (শিষ্যদের) ধুওয়ে দেন। এক প্রত্যেককে ভালোবাসতে বলেন। পরক্ষনে তিনি বলেন যে তাদের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতকতা করবে। এক পিটার দু বার যিশুকে অস্বীকার করবে। যা পরবস্তুকালে ঘটেছিল। রোমের গর্ভনর সাইমনটাস যিশুর মৃত্যুদণ্ড সাজা দেন। যিশুকে ক্রুসবিদ্ধ করা হয়। ক্রুসবিদ্ধ থাকাকালীন তিনি বললেন যে এরা কিছু জানে না ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করুন। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর পরবর্তী অংশ রহস্যজন তার ক্রুসবিদ্ধ অংশ এক গুহার ভিতর রাখা হয় যদিও তা বন্ধ করে দেওয়া হয় বাইরে থেকে, কিন্তু তারপরদিন গুহা খোলা পাওয়া যায় যিশুকে আর দেখা যায় নি। এইভাবে যিশুর রহস্য রয়ে যায়।

এবার আমি দুই মহামানবের নীতি রীতি মিলের দিকে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির মতে যিশু নাকি ভারতবর্ষের দিকে এসেছিলেন তার কৈশরকালে এক বৌদ্ধধর্ম তার আসে। এক বাইবেলেও তার কৈশরকালের খুব বেশি বর্ণনা নেই। দুই ধর্মের অনেক মিল রয়েছে যিশুর জন্মানোর আগে পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরে সিরিয়া, গ্রিক, পর্যন্ত বৌদ্ধদের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। দুই ধর্মে মূর্তিপূজার কথা বলে। বিভিন্ন দেবী দেবতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। যেমন বুদ্ধর জীবন

কাহিনীর (জাতকের) মাধ্যমে লোককে নীতি কথা শিখানো হয়। বাইবেলে এমন উল্লেখ রয়েছে। বুদ্ধ ও যিশুর বাণী ও নিয়মকানুন অনেকটা মিল পায়। খ্রিস্টের যে হস্তমুদ্রা তাও মিল আছে বুদ্ধের সাথে। তাছাড়াও বুদ্ধের মধ্যে যে করুণা ও একধরনের প্রকাশ। বহু ঐতিহাসিকগণ বৌদ্ধধর্মের সাথে খ্রিস্টধর্মের একটা যোজক পাওয়া যায়। ধর্মের মূলকথা মানুষের কষ্ট দূর করা যা এই দুই মহাপুরুষের ইচ্ছা।

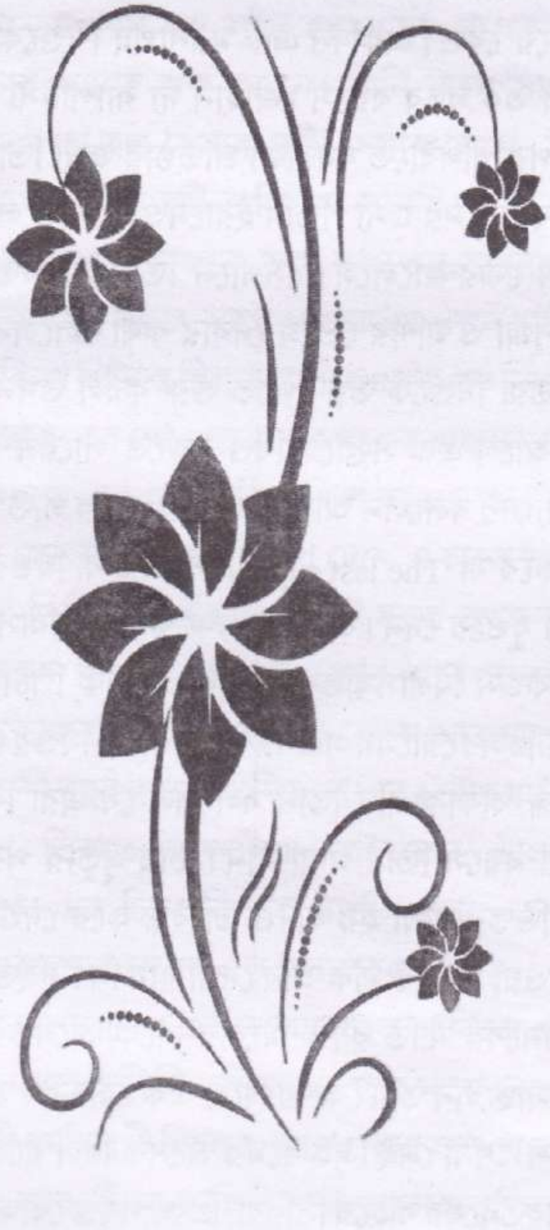

শিক্ষা ও সমাজ

— সুমন অট্ট

According to Nelson Mandela, "Education is the most powerful weapon we can use to change the world!"

শিক্ষা মানবজাতির বৃদ্ধি ও বিকাশের একটি সিঁড়ি, শিক্ষা সমাজকে একটি উন্নত বিশ্বে রূপ দেয়। বর্তমান সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব বোঝা অপরিহার্য। সহজ কথায় শিক্ষা হল জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, বিশ্বাস এবং অভ্যাস শেখার বা অর্জন করার একটি প্রক্রিয়া। শিক্ষা অর্জন এবং প্রদানের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বেশ কয়েকটি ধাপ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ, আলোচনা, গবেষণা, গল্প বলা এবং অনুরূপ অন্যান্য মিথস্ক্রিয়ামূলক কার্যক্রম। শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা প্রথাগত এবং প্রথাবহির্ভূত উভয়ই হতে পারে যাকে Pedagogy বলা হয়। প্রাক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথাগত শিক্ষা অর্জন করা হয়। যাইহোক, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা আসে স্ব-নির্দেশিত শিক্ষা, প্রমাণ-ভিত্তিক শিক্ষা, উন্মুক্ত শিক্ষা এবং ইলেকট্রনিক শিক্ষা থেকে। শিক্ষা যেকোন রূপে একজন ব্যক্তি এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের জীবনকে সংস্কার করে। আসুন আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে কেন শিক্ষা গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব কী?

আধুনিক সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব আরও বেশি। বর্তমান প্রজন্মের উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ অর্জন এবং নিজেদের উন্নত নাগরিকে পরিণত করতে শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষার মাধ্যমে উচ্চ আয়ের চাকরি নিশ্চিত করা তখনই সম্ভব যখন মানুষ সমাজের জন্য সাক্ষরতা ও শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। আধুনিক সমাজে আধুনিক সমস্যা রয়েছে এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজ অনেক মানবিক সমস্যার সমাধান করতে পারে। সমাজে শিক্ষার অর্থ ও গুরুত্ব তখনই স্পষ্ট হয় যখন আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেখি। শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষিত কর্মচারীরা অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে। তাদের অর্জনগুলি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর লোকদের জীবনকেও পরিবর্তন করে।

ভারতীয় সমাজ প্রাচীনতম সভ্যতার মধ্যে একটি যেখানে শিক্ষার প্রচার করা হয়। ভারতে প্রাচীনতম গুরুকুল থেকে শুরু করে আইআইটি এবং আইআইএম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং দেশের সাক্ষরতার হার ৭৫ শতাংশ। কেরালা সর্বাধিক সাক্ষরতার হার ৯৩ শতাংশ অর্জন করেছে যেখানে বিহারে ৬৩.৮২ শতাংশ সাক্ষরতার হার যা ভারতের সর্বনিম্ন সাক্ষর রাজ্য। সর্বভারতীয় স্তরে সাক্ষরতার হার ১৫ বছরের উর্ধ্বে ৬৯.৩ শতাংশ, যেখানে পুরুষদের মধ্যে ৭৮.৮ শতাংশ এবং মহিলারা ৫৯.৩ শতাংশ। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হারে গ্রামীণ শহরে ব্যবধান

বিদ্যমান। ভারতে সমাজে নারী শিক্ষার গুরুত্ব সবসময়ই একটি সামাজিক উদ্বেগের বিষয়। একটি মেয়ে শিশুর তাড়াতাড়ি বিয়ে হয় এবং পরিবারের যত্ন নেয়, এই ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের কারণে ভারতে নারীরা কম শিক্ষিত ছিল। অবশেষে, মানুষ সমাজে কন্যাশিশু শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। নারীরাও পুরুষের মতো শিক্ষা গ্রহণের সমান অধিকারী। প্রকৃতপক্ষে, মহিলারা বেশ কয়েকটি প্রতিযোগিতামূলক এবং জাতীয় পরীক্ষায় পুরুষদের ছাড়িয়ে গেছে। একজন নারী শিক্ষিত হলে সমগ্র সমাজ শিক্ষিত হয়। কিন্তু একজন পুরুষ যখন শিক্ষিত হয়, তখন একমাত্র সেই শিক্ষিত হয়। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাবে বিশ্বাস করি, তাহলে আমাদের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। সমাজে নারীদের জ্ঞান দান করলেই, একটি জাতির একসাথে অগ্রগতি হবে। ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী সকল মানুষের জন্য বিশ্বব্যাপী সাক্ষরতার হার হল ৮৬.৩ শতাংশ। সমস্ত পুরুষের জন্য বিশ্বব্যাপী সাক্ষরতার হার ৯০ শতাংশ এবং সমস্ত মহিলাদের হার ৮২.৭ শতাংশ। এটি স্পষ্টভাবে মানুষ এবং সুযোগের মধ্যে ব্যবধান দেখায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের জন্য প্রথাগত শিক্ষার উৎস। প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজকে শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব শেখায়। প্রতিষ্ঠানগুলিতে, ছাত্রদের সমাজে শিক্ষার সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কেও সচেতন করা হয়। সবশেষে, শান্তি শিক্ষা আমাদের সমাজে জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব নির্ধারণ করে।

প্রতিষ্ঠান হল একটি শান্তিপূর্ণ ও প্রগতিশীল সমাজের বিল্ডিং ব্লক। প্রতিটি জাতির উচিত যতটা সম্ভব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য কাজ করা। যুবসমাজকে যতটা সম্ভব প্রতিযোগিতামূলক ও আত্মনির্ভরশীল করতে মানবসম্পন্ন ও বিশ্বমানের শিক্ষা প্রদান অপরিহার্য। বর্তমানে সারা বিশ্বে হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তবুও শিক্ষার্থীরা একটি কলেজে ভর্তির জন্য লড়াই করে। বিকল্প উৎস দিয়ে এই ব্যবধান পূরণ করা প্রয়োজন।

"Live as if you were do die tomorrow. Learn as if you were to live forever." —**Mahatma Gandhi**

"The roots of education are bitter, but the fruit is sweet." —**Aristotle**

*" Come I may, but go I must and if men ask you why you may blame the sum and the stors the wihte road in the sky." — **Gould Ed.***

প্রথম বর্ষ

১। সোহম মণ্ডল
রোল - ০২
পোঃ - রানীবাঁধ
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪৮

২। চিন্ময় মণ্ডল
রোল - ০৩
পোঃ - শালডিহা
পিঠাবাইদ
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৯

৩। অনন্ত মাজি
রোল - ০৪
পোঃ - বাঁশী চণ্ডীপুর
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫৪

৪। তরুন মাহাতো
রোল - ০৬
পোঃ - বড় গদরা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫০

৫। সুরজ মাজি
রোল - ০৭
পোঃ - রামসাগর
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪৭

৬। শুভজিৎ ঘোষ
রোল - ০৮
পোঃ- খুলামুড়ি
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫২

৭। গোবিন্দ কর
রোল - ০৯
পোঃ - চিঙ্গানী
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫২

৮। রাহুল মাল
রোল - ১০
পোঃ - হীরাপুর
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫২

৯। অঙ্কিত দত্ত
রোল - ১১
পোঃ - রতনপুর
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫২

১০। বরকত মল্ল
রোল - ১২
পোঃ - বৈতল
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৮

১১। আকাশ পতি
রোল - ১৩
পোঃ - আরকামা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪০

১২। আয়েতুল্লা খান
রোল - ১৪
পোঃ- পিয়ারডোবা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪৯

১৩। অর্জুন গরাই
রোল - ১৫
পোঃ - জামতোড়া
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৭

১৪। সুমন সরেন
রোল - ১৬
পোঃ - মাচাতোড়া
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫১

১৫। শোভন ঘোষ
রোল - ১৭
পোঃ - অশ্বিনকোটা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৮

১৬। অচিন্ত পাল
রোল - ১৮
পোঃ - গড় রাইপুর
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৪

১৭। সুদীপ মণ্ডল
রোল - ১৯
পোঃ - রানীবাঁধ
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪৮

১৮। শান্তনু কর
রোল - ২০
পোঃ- চিঙ্গানী
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫২

১৯। শুভদীপ নন্দী
রোল - ২১
পোঃ - আনারা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৪

২০। বিকাশ ব্যানার্জী
রোল - ২২
পোঃ - গোগড়া
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৭

২১। অমিত কুমার পাল
রোল - ২৩
পোঃ - মানিকবাজার
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২২০৭

২২। সত্যজিৎ রায়
রোল - ২৪
পোঃ - চকশ্যামপুর
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫২

২৩। অভিষেক মণ্ডল
রোল - ২৬
পোঃ- বগা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন -

২৪। রাকেশ কালিন্দী
রোল - ২৭
পোঃ - শালডিহা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৭৩

২৫। সুমন বাউরী
রোল - ২৮
পোঃ - ব্রাহ্মনডিহা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৭

২৬। অনুপকুমার সৎপতি
রোল - ২৯
পোঃ - পিউপাল
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫১

২৭। পিযূস মণ্ডল
রোল - ৩০
পোঃ - মণ্ডলকুলি
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৪

২৮। ইন্দ্রজিৎ হাঁসদা
রোল - ৩১
পোঃ - সারেঙ্গা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫০

২৯। কৌশিক প্রতিহার
রোল - ৩২
পোঃ- গেলিয়া
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫৪

৩০। অয়ন মিশ্র
রোল - ৩৩
পোঃ - গড় রাইপুর
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৪

৩১। জয়দেব পরামানিক
রোল - ৩৪
পোঃ - বুধনপুর
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৭

৩২। বনমালী মণ্ডল
রোল - ৩৫
পোঃ - ঘোলকুণ্ডা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫২

৩৩। সুমন মণ্ডল
রোল - ৩৬
পোঃ - ইন্দপুর
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৬

৩৪। সৌম্যদীপ মণ্ডল
রোল - ৩৭
পোঃ - সাতপাতা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৪

৩৫। উজ্জ্বল কুমার পতি
রোল - ৩৮
পোঃ- মণ্ডলগ্রাম
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫৬

৩৬। রামকৃষ্ণ সরেন
রোল - ৩৯
পোঃ - সুখাডালি
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫০

৩৭। রঞ্জন দুলে
রোল - ৪০
পোঃ - মণ্ডলকুলি
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৪

৩৮। কৌশিক ঘোষ
রোল - ৪১
পোঃ- রাধামোহনপুর
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২২০৭

৩৯। সায়নিক মণ্ডল
রোল - ৪২
পোঃ - খরিগেরিয়া
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৪

* * *

“ নিজের উপর বিশ্বাস কখনো হারিও না, এ জগতে তুমি সব করতে পারো। কখনো নিজেকে দুর্বল ভেবো না, সব শক্তি তোমার ভিতর রয়েছে।” —— স্বামী বিবেকানন্দ

দ্বিতীয় বর্ষ

১। শাহনওয়াজ মণ্ডল
রোল - ০১
পোঃ - ধরা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৮

৩। সৌরভ সরেন
রোল - ০৩
পোঃ - খুলামুড়ি
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫২

৪। সোমনাথ রায়
রোল - ০৪
পোঃ - সরলিয়া
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫২

৫। শুভজিৎ মণ্ডল
রোল - ০৫
পোঃ - রানীবাঁধ
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪৮

৬। সমীর মাহাতো
রোল - ০৬
পোঃ - সলাপাহাড়ী
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৬

১০। অর্ঘ্য সাহা
রোল - ১০
পোঃ - কোতুলপুর
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪১

১১। দেবজিৎ মালি
রোল - ১১
পোঃ - ময়নাপুর
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৮

১২। রাহুল মণ্ডল
রোল - ১২
পোঃ- সোনারডাঙ্গা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৭৩

১৩। রাজেশ মল্ল
রোল - ১৩
পোঃ - সাবড়াকোন
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪৯

১৫। রামনাথ গোস্বামী
রোল - ১৫
পোঃ - হুমগড়
জেলা- পশ্চিমমেদিনীপুর
পিন - ৭২১২৫৭

১৬। শুভাশীষ বেজ
রোল - ১৬
পোঃ - বদনগঞ্জ
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭১২১২২

১৭। আবীর পরামানিক
রোল - ১৭
পোঃ - হাড়মাসড়া
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫২

১৮। অমিত কুমার গরাই

রোল - ১৮
পোঃ - ওন্দা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪৪

২০। সৌভিক পয়লা

রোল - ২০
পোঃ- বাঁকুড়া
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১০১

২১। মনসা পাঁজা

রোল - ২১
পোঃ - পাণ্ডুয়া
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২২০৬

২৩। দেবাংশু দে

রোল - ২৩
পোঃ - মদনমোহনপুর
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪১

২৪। অমিত চৌধুরী

রোল - ২৪
পোঃ - সাবড়াকোন
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪৯

২৫। নির্মাল্য খান

রোল - ২৫
পোঃ - লাউগ্রাম
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪১

২৬। মনোরঞ্জন মণ্ডল

রোল - ২৬
পোঃ - হেতিয়াশোল
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪০

২৭। চিন্ময় ঘটক

রোল - ২০
পোঃ- দিগপার
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১২২

২৮। অভীক মণ্ডল

রোল - ২৮
পোঃ - বিবড়দা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫২

২৯। প্রতীম মুখার্জী

রোল - ৩০
পোঃ - সুপুর
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১২১

৩০ পদ্মলোচন কর

রোল - ৩১
পোঃ - বেহলাডিহা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২১৫১৫

৩১। **রসিক সরেন**

রোল - ৩২
পোঃ - মৌকুরা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫০

৩২। সুব্রত হাঁসদা
রোল - ৩৩
পোঃ- খড়বনা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৭

৩৩। ইন্দ্রজিৎ দাস
রোল - ৩৪
পোঃ - সারেঙ্গা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫০

৩৪। অসীম কুমার মণ্ডল
রোল - ৩৫
পোঃ - মিঠান
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪৮

৩৫। অক্ষয় শীট
রোল - ৩৬
পোঃ - মামরা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৪৯

৩৬। সৌমেন সাঁতরা
রোল - ৩৮
পোঃ - তাজপুর
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৬১

৩৭। দেবকান্ত ঘোষ
রোল - ৩৯
পোঃ - কুশদ্বীপ
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২২০৭

৩৮। সোহম গাঙ্গুলী
রোল - ৪০
পোঃ- পাত্রসায়ের
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২২০৬

৩৯। প্রীতম ভট্টাচার্য্য
রোল - ৪১
পোঃ - সারেঙ্গা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৫০

৪০। ইন্দ্র হেন্‌স
রোল - ৪২
পোঃ - বদনগঞ্জ
জেলা- হুগলী
পিন - ৭১২১২২

৪১। লাল্টুগোপ মণ্ডল
রোল - ৪৩
পোঃ - রাঙা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৬

৪২। বিপ্লব গরাই
রোল - ৪৪
পোঃ - উখরাডিহি
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৩

৪৩। অয়ন নন্দী
রোল - ৪৫
পোঃ - পারকুড়া
আনারা
জেলা- বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১৩৪

৪৪ সাহাবুদ্দিন খান
রোল - ৪৬
পোঃ- দ্বারিকা
জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১২২

" Schools are not knowledge shops and teachers are not information mongers"
— John Adams